Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খিলাফত ও গনতন্ত্র কোনটা উত্তম

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-

আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

Tasmin Jannat

রোলঃ২২৭০২০৫৩০

০১ডিসেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খিলাফত ও গণতন্ত্র কোনটা উত্তম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Tasmin Jannat
রোলঃ২২৭০২০৫৩০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “খিলাফত ও গণতন্ত্র কোনটা উত্তম” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসমিন জান্নাত, আইডিঃ ২২৭০২০৫৩০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>এক্সটারনালঃ</u>

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ খিলাফত ও গনতন্ত্র কোনটা উত্তম ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

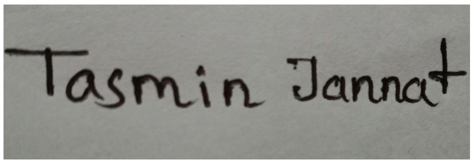

স্বাক্ষর

তাসমিন জান্নাত

আইডি:২২৭০২০৫৩০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা

তারিখ:

০১ডিসেম্বর,,২০২৪ ইং

সূচিপত্র

১)ভূমিকা-----০৭

২)ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা-----০৮

৩)খিলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্র-----১০

৪)খিলাফত-----১০

- সংজ্ঞা
- দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি ও বিধান
- খলিফা হওয়ার যোগ্যতা
- খুলাফায়ে রাশিদা
- খিলাফতের সফলতা
- খিলাফতের পতন
- মজলিশে শুরার পরিচয়
- মজলিশে শুরার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- মজলিশে শূরার প্রকার
- মজলিসে শূরার গঠন পদ্ধতি
- মজলিসে শূরার প্রকৃতি
- মজলিশে শূরার কার্যাবলি
- সংসদ ও মজলিসে শূরার তুলনা
- খলীফা নির্বাচন পদ্ধতি

৫)গনতন্ত্র-----৪৩

- সংজ্ঞা
- উৎপতি
- প্রকারভেদ
- স্তম্ভ
- মূলনীতি
- সরকার নির্বাচন পদ্ধতি
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দর্শন

৬)গণতন্ত্রের ত্রুটি-----৫৬

৭)খিলাফত ও গণতন্ত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ-----৫৯

৮)নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের একটি প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-----৭৮

৯)গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কেমন যেন মনুষের রব!!!-----৮৯

১০)গণতন্ত্র কেন কুফরী??-----৯০

১১)গণতন্ত্র কেন জাহিলিয়্যাত??-----৯২

১২)গণতন্ত্র ওরফে ধোঁকাতন্ত্র-----৯৪

- গনতন্ত্র মানে কি স্বাধীনতা?
- প্রতিনিধি কি সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচিত?
- অধিকাংশ জনগণের মত অনুসারে কি শাসন চলে?
- ইসলামী গণতন্ত্র কি কখনো হয়?

১৩)উপসংহার-----৯৮

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে আশ্রয় চাই, তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই এবং আমরা তাঁর কাছে পানাহ চাই নফসের প্রতারণা হতে এবং আমাদের খারাপ কাজ হতে। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না, আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং শেষ রাসূল। তিনি আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। মহানবী মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবাগণ এবং যারা তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ করবে তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

আমীন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَ رَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا ؕ

অর্থ:আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে(সূরা মায়িদা ৪:৩)

আরো বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسرين

অর্থ:আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আলি 'ইমরান ৩:৮৫)

মহান আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারিত, নির্বাচিত ও মনোনীত করেছেন। যে কারণে মানব জীবনের প্রতিটি দিক

সম্পর্কে এখানে সুস্পষ্ট বিধানসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এ বিধানসমূহ মানুষকে কেবল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাই দেয় না বরং মানুষের সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্যও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। মূলতঃ এ সকল নির্দেশনারই বাস্তবচিত্র ইসলামী রাষ্ট্র। এ হলো ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দর্শনের কাঠামোবদ্ধ রূপ।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে শাসনব্যবস্থার বিকাশ এবং রূপান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসলামি খিলাফত, যা আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ ﷺ এর নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। খিলাফত রাশিদাহর শাসনকালে ন্যায়বিচার, সামাজিক সমতা এবং সার্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠা মুসলিম বিশ্বের গৌরবময় অধ্যায় হয়ে আছে। অপরদিকে, গণতন্ত্র একটি আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা জনগণের মতামত ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এটি পশ্চিমা সভ্যতায় জনপ্রিয় হলেও এর কার্যকারিতা নিয়ে মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে।

বর্তমান যুগে মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিরতা, শাসনব্যবস্থায় নৈতিকতার অভাব এবং সঠিক নেতৃত্বের সংকট খিলাফত ও গণতন্ত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এই গবেষণায় আমরা উভয় ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি, ইতিহাস এবং সমকালীন প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। পাশাপাশি ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং খিলাফতের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে ইনশা আল্লাহ্,ওমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্।

ইসলমী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা:

ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শিক বিশ্বরাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র একান্তভাবে ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শের অনুসারী। এ রাষ্ট্রের জনসমষ্টি ইসলামী অনুশাসন অনুশীলন করেন। এর ভূখণ্ডগত অবস্থান, সরকারব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্ব ইসলামের বিধিবিধানের অনুসরণে গড়ে ওঠে। এ

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা কুরআন-সুন্নাহের নির্দেশনার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা, আধিপত্য ও শাসনতন্ত্র রচনার একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ অধিকার কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। এ ক্ষমতায় তাঁর কোনো শরীক নেই। একক ও একমাত্র মালিক তিনিই। এই মর্মে কুরআন মাজীদে বিঘোষিত হয়েছে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা,

إن الحكم إلا لله يقص الحقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفاصلين

"কর্তৃত্ব তো শুধুই আল্লাহর। তিনি সত্য কর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।" (সূরা আনআম: ৫৭)

- তাই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব, আধিপত্য ও আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার এবং সকল মানুষের সমানভাবে আল্লাহর বান্দাহ হওয়া ও সমভাবে সকলেই তাঁর নিকট দায়ী থাকার সুস্পষ্ট স্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায়

মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ,আইনজ্ঞ ও চিন্তাবিদগণ একে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাজীদ খাদ্দুরী বলেছেন, "ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের একটি সামষ্টিক প্রতিষ্ঠান হলো ইসলামী রাষ্ট্র।"

সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবন খালদুন বলেন, "নাগরিকের বৈষয়িক, পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণসাধনের সার্বিক দায়িত্বগ্রহণকারী ইসলামী শরীআসম্মত রাজনৈতিক সংগঠনই ইসলামী রাষ্ট্র।

আল্লামা সারাখশী তার 'সিয়ারুল কবীর' শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "মুসলিমদের শাসন ও কর্তৃত্বাধীন ভূ-খণ্ডের নাম হলো ইসলামী রাষ্ট্র।

ইমাম আবু হানীফা **(র)'**র মতে, "যে রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক মুসলিম এবং যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ ইসলামী নিয়মনীতি অনুসারে পরিচালিত হয় তাই ইসলামী রাষ্ট্র।"

মুফতী মুহাম্মদ শফী বলেন, "কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।"

ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায়, 'দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে ইসলামী শরীআ অনুসারে সাধারণ কর্তৃত্ব এবং রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।"

জমহুর আলিমের মতে, "ইসলামী রাষ্ট্র এমন একটি ভূ-খণ্ড যা মুসলিম অধ্যুষিত এবং যেখানে ইসলামী শরীআ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এ রাষ্ট্রে অমুসলিম জনগণও থাকবেন কিন্তু তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অর্থাৎ ক্ষমতা থাকবে মুসলিমদের হাতে আর পরিচালনার নীতি হবে ইসলামী শরীআহ- তাহলেই রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে।

অর্থাৎ,যে রাষ্ট্রের কাঠামো গঠন, আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার ব্যবস্থা ইসলামী শরীআ অনুযায়ী পরিচালিত হয়; যার রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন একজন যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ; সে রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হোক বা না হোক তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

খিলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্র

ইসলাম রাষ্ট্রব্যবস্থার যে সুষ্ঠু কাঠামো প্রবর্তন করেছে তার মূল চেতনা হলো খিলাফত। এটি হলো ইসলামী রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবধারা। এ ধারণা থেকেই ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেছে। খিলাফততন্ত্রের ওপরই ইসলামী রাষ্ট্র ও তার কাঠামো নির্ভরশীল। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আইনবিদগণ খিলাফতকে ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

খিলাফত

সংজ্ঞা:

শাব্দিক বিবেচনায় খিলাফত শব্দটি খলীফা শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রতিনিধিত্ব, স্থলাভিষিক্ত, অন্য কারো অপসৃত হওয়ার পর তার স্থানে উপবেশন করা ইত্যাদি। যেমন পৃথিবীতে সকল মানুষই আল্লাহ তা'আলার খলীফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টির সময় ঘোষণা দিয়েছেন,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خليفة

"নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাতে চাই।"
(সূরা বাকারা ২:৩০)
পারিভাষিক বিবেচনায়, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে খিলাফত নামে অভিহিত করা হয়। আর যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন বা স্থলাভিষিক্ত হন তারে খলীফা বলা হয়। ইসলামী রাজনৈতিক দর্শন ও জীবনব্যবস্থায় নবুয়তের পর খিলাফতই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ।
খিলাফত একটি ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজশৈরিক। বিশ্লেষকগণও একে 'Religious Socio-Political Institution' বলে অভিহিত করেছেন। ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ খিলাফতকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-
প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মাজীদ খাদ্দুরী বলেছেন, "খিলাফত হচ্ছে ইসলাই আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান।" (উমামিল ইসলামীয়া)
ইমাম ইবন তাইমিয়া **(র)** বলেন, "খিলাফত এমন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ করা হয়।" (আল সিয়াসাহ)
সাহাবা আবু মুসা আশআরী **(রা)** বলেছেন, "খিলাফত হচ্ছে তা যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে। আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো বাদশাহী।"
বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদুন বলেন, "ইসলামী আদর্শের সংরক্ষণ তদানুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনা হলো খিলাফত।" তার মতে, "খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মহানবী ﷺ-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যালকমার বলেন, "বাহ্যিক দিক দিয়ে নয় বরং তাত্বিক দিক দিয়ে শাসন কাজের সাথে ধর্মীয় গুণাবলি জুড়ে দেয়াই হলো খিলাফত।”
ইমাম আবু হানীফা **(র)** বলেন, 'মতামতের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্মতি এবং পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম খিলাফত।’
আল্লামা সারাখসী **(র)** বলেন, "মুসলিমদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রকে বলা হয় খিলাফত”

কাজেই খিলাফত হচ্ছে মুসলিমদের জন্য বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর আইনগত কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে মুসলিমদের নির্বাচিত ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বিবৃত রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা অনুসরণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দীন দুনিয়ার দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন এবং মুসলিমদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি ও বিধান :

খিলাফত একটি নির্বাচনভিত্তিক পদ্ধতি। মুসলিম জাতির পারস্পারিক পরামর্শ। স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীতে বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়ে খিলাফত দুনিয়া ও আখিরাতের যিম্মাদার হ যাবে। খিলাফতের দায়িত্ব তাই বিপুল, সীমাহীন ও তাৎপর্যপূর্ণ।

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ : ইসলামী খিলাফত বা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রদ বৈশিষ্ট্য হলো এতে সার্বভৌম ক্ষমতার নিরঙ্কুশ ও একচ্ছের মালিকানা আছে তা'আলার। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وللهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা কেবল আল্লাহরই। আর আল্লাহ সক কিছুর ওপর শক্তিমান।" (সূরা আলে ইমরান: ১৮৯)। শাসন পরিচালনার সরু পর্যায়ে আল্লাহর এ হক সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া খিলাফতের দায়িত্ব পালনো প্রথম ও প্রধান কথা।

২. ইসলামের সার্বিক উন্নয়ন: আদর্শ ও তত্বগত দিক থেকে দীন ইসলাম সংবিধান, দীনের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচার এবং মুসলিমদের মধ্যে দীনের প্রতি বিশ্বাসের স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। এ মূল লক্ষ্যই থাকবে ইসলামের সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করা।

৩.বুনিয়াদী ইবাদত অব্যাহত রাখা: দীন ইসলামের বাস্তব ভিত্তিসমূহ অর্থাৎ সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সামাজিকভাবে এ সকল ইবাদত আদায়ে তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার গাফলতি সৃষ্টির সুযোগ না দেয়া। বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে মৌলিক ইবাদতগুলো আদায়ের ব্যবস্থা রাখা।

৪.ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা: খিলাফতের দায়িত্ব পালনের মূলকথা হলো রাষ্ট্রের সর্বত্র পুরোপুরি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য ব্যবহারিক চিন্তা, প্রয়োজনীয় মীমাংসা ও আইন প্রতিষ্ঠায় এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। শাসনের সকল পর্যায়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করা যায়।

৫. আন্তঃবিবাদ-সংঘর্ষে ফয়সালা দান:মুমিনদের বিবাদমান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আল্লাহর আইন কার্যকর করে, পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদ-মনোমালিন্যে ইসলামী আইন অনুসারে ফয়সালা প্রদান করে এ দায়িত্ব পালন করা যায়। আল্লাহ বলেন,

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

"আর যদি মুমিনদের দুটি দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেবে।" (সূরা হুজুরাত: ৯)

খিলাফত মুমিনদের পারস্পারিক এবং মুমিনদের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও দলের আন্তঃদলীয় সম্পর্ক সুন্দর রাখায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা: ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিজন নাগরিকের বৈধ দখলিস্বত্ব বেআইনী দখল থেকে মুক্ত রেখে, তাদের প্রত্যেকের বাধাহীন নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা যায়।

৭. অপরাধ নির্মূল করা :শরীআতের হদ ও কিসাস বা শাস্তিমূলক দণ্ডবিধান কার্যকর করে আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত সকল অনৈতিক অপরাধের পথ চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা যায়।

৮. নাগরিকদের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা: সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন, দুর্বলকে শক্তিশালী ও সবলকে নিয়ন্ত্রণ আর প্রত্যেকের অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এভাবে নাগরিক অধিকারে সমতা প্রতিষ্ঠা করে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

৯. জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা: রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল মানুষেরজীবনযাপনের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কারো জীবনে শঙ্কার সৃষ্টি হয় বা কেউ জীবন সংশয়ে পড়ে এমন সকল কাজ বন্ধ করা। আলাহ তা'আলা বলেন,

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

"যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তোমরা তাকে হত্যা কর না।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৩) আল্লাহর এ নির্দেশ ও নির্দেশনা মেনে খিলাফত সকল অন্যায় হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করবে।

১০.সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করা: মুমিনদের সম্মান, সম্ভ্রম, সামাজিক মর্যাদা ও ইযযত সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে খিলাফতের দায়িত্ব পাদ করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لمايسخر قوم من قوم .... ولا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

“হে মুমিনগণ। কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে;.... তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না।" (সূরা হুজুরাত: ১১)

اجتنبوا كثيرًا من الظن ... ولا تجسسوا وَلَا يَغتَب بَعْضُكُم بَعْضًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ (ক্ষেত্রে) অনুমান থেকে বিরত থাক;....তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরে পেছনে নিন্দা কর না।" (সূরা হুজুরাত ১২)। কেবল ব্যক্তি পর্যায়েই নয় বর সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ইসলামের এই শিক্ষা ও আদর্শকে সমুন্নত রেখে সকলের সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে খিলাফতের সুমহান দায়িতে আঞ্জাম দেয়া যায়।

১১.সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:নাগরিকদের অর্থ সম্পদ, ধন ঐশ্বর্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য লুটতরাজ, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাং সুদ, ঘুষ, প্রতারণা প্রভৃতি বন্ধে ইসলামী আইন প্রয়োগ করা। কেউ যাতে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদে ভোগ দখল প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

১২. বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা :নিরাপদ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সমাজের সদস্যদের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, জন্মের আগে বা পরে শিশু হত্যার প্রবণতা রোধ করা প্রভৃতির মাধ্যমে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা যায়।

১৩. মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা :খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন হলো ইসলামী খিলাফতে নাগরিকদের মৌলিক মানবিক অধিকার। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উপায় হলো নাগরিকদের এ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে খিলাফত সকলের দায়িত্ব নেবে ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এমন অবস্থা বা কাঠামো গড়ে তুলবে, যাতে সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ তৈরি হয়। এভাবে ভূমিকা পালনের পরও যারা অসহায় ও দুঃস্থ থেকে যাবে, খিলাফত প্রত্যক্ষভাবে কেবল তাদেরই দায়িত্ব নেবে।

১৪. ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা : রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল ধর্ম ও মতের মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে এবং কেউ যেন অন্যের ধর্ম পালনে কোনো বাঁধা দিতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

১৫. জিহাদ পরিচালনা: এ দায়িত্ব পালনের আরেকটি উপায় হলো, ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দান বা জিযিয়ার বিনিময়ে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে বা ইসলামী রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা ও পরিচালনা।

১৬. রাষ্ট্রীয় পাওনা আদায়: যাকাত, সাদাকাহ ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা। কেউ যেন এ ক্ষেত্রে ফাঁকি দিতে না পারে আবার কেউ যেন নির্যাতিত-শোষিত না হয় তা নিশ্চিত করা।

১৭. বায়তুলমাল সংরক্ষণ: খিলাফতের দায়িত্ব পালনের একটি উল্লেখযোগ্য উপায় হলো বায়তুলমাল সংরক্ষণ করা। এর সম্পদের অপচয়, অপব্যবহার বা আত্মসাতের সকল পথ বন্ধ করা।

১৮. যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ: রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং মেধা ও সৃষ্টিশীলতার যথাযথ লালন ও পরিচর্যার জন্য প্রতিটি বিভাগে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করার মাধ্যমেও খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

১৯.জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা: এ দায়িত্ব পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জাতির অবস্থা ও ভাগ্যের সাথে জড়িত বা জাতীয় মালিকানাধীন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সামষ্টিক স্বার্থ সংরক্ষণে নির্লোভ ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২০. সামরিক শক্তি অর্জন: খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়। আর দেশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং বাইরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সামরিক শক্তি অর্জন করা অনিবার্য। এর পাশাপাশি সক্ষম ও সবল সকল মুমিনের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে সামরিক শক্তিকে সাধ্যের শীর্ষচূড়ায় পৌছানো যায়। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য এ শক্তি অর্জন আবশ্যক।

২১. দুর্বল ও অভাবীদের সাহায্য করা: রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অভাবগ্রস্ত ও দুর্বলদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা যায়। কেননা দুর্বল ও অভাবগ্রস্তদের ব্যাপারে সমাজের বিত্তশালী লোকদের দায়বদ্ধতা আছে। খিলাফতের

দায়বদ্ধতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অভাব দূর করা এবং শক্তি ও সাহস দিয়ে সহযোগিতা করাকে অনিবার্য করেছেন।

২২. মুবাল্লিগের ভূমিকা গ্রহণ: খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে বড় উপায় হলো ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করা। নিজে সমাজের লোকদের সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজে নিষেধ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ দায়িত্ব বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর ওপর ন্যস্ত করেছেন।

খলীফা হওয়ার যোগ্যতা:

১. মুসলিম হওয়া:খলীফাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কেননা ইসলামের সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হন। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাজের গুরুদায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়। আল্লাহ তা'আলা কেবল মুসলিমদেরই ক্ষমতাসীন করার অঙ্গীকার করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وعَدَ اللهُ الَّذِينَ امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهُمْ فِي الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليُمكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارتضى لهم وليُبدلنهم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا طَ يَعْبُدُونَنِي لا يشركون بي شيئا ط ومن كفر بعد ذالك فَأُولَئِكَ هُم الفَاسِقُون

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেমন তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের আগের লোকদের আর তিনি তাদের জন্য অবশ্যই তাদের দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। তাদেরকে তিনি ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না, এরপর যারা অবিশ্বাসী হবে তারা তো সত্যত্যাগী।" (সূরা নূর: ৫৫) খিলাফত ইসলামের আদর্শ ও নীতি অনুসারে পরিচালিত হয় বলে অমুসলিম কেউ খলীফা হতে পারে না। কেননা অমুসলিম ব্যক্তি কখনই ইসলামী আইন অনুসারে রাষ্ট্র শাসন করবে না। তা ছাড়া মুসলিমদের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য ফরয। রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম না হলে এ ফরযিয়াত মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

আল্লাহ তায়লা বলেন,

يا أَيُّهَا الَّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُول

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহর বিধান অনুসারে) আদেশ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন তাদের আনুগত্য কর। এরপর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট অর্পণ কর।" (সূরা নিসা: ৫৯)

খলীফা মুসলিম না হলে একদিকে যেমন তার আনুগত্য করা যাবে না, তেমনি তার পক্ষে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করাও সম্ভব হবে না। সুবিচার, সাম্য, ইহসান ও আদল প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে লক্ষ্য তা অর্জিত হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, খলীফা মুসলিম না হলে তিনি ইসলামের প্রচার, প্রসার বা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন, যাতে ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করবে। তাই খলীফা হওয়ার প্রথম যোগ্যতা হলো মুসলিম হওয়া।

২. পুরুষ হওয়া:খলীফা হওয়ার অন্যতম প্রধান যোগ্যতা হলো পুরুষ হওয়া। খলীফা কোনোভাবেই মহিলা হবেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন,

الرِّجالُ قَوَّامُونَ على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

“পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, দায়িত্বশীল। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের একজনের ওপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন" (সূরা নিসা: ৩৪)

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "সে জাতি কখনোই সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করবে না, যে জাতি তাদের নেতৃত্ব অর্পণ করবে নারীকে (সহীহ বুখারী।)

৩) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া: শিশু বা কিশোর খলীফা হতে পারবেন না। শাসনকার্য সুচারুরূপে পরিচালনার মতো উপযুক্ততা তাদের থাকতে হবে। কেননা কম বয়স্ক হলে কাঙ্খিত ফরয আনুগত্যের ধারা ব্যাহত করবে। তার ওপর ইবাদত ফরয নয় বলে সে ইবাদতে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। তাছাড়া তার বয়সগত ও বুদ্ধিগত অপরিপক্কতার জন্য তাকে মেনে

চলাও ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনুচিত কাজ বলে বিবেচিত হবে। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তুলনামূলক জ্যেষ্ঠ হবেন। তাকে সকলের চেয়ে বয়সে বড় হতে হবে- ব্যাপারটি এমন নয়। বরং তার বয়স যেন আনুগত্যে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।অন্ততঃ এমন বয়স হতে হবে, যাতে তাকে মান্য করা যায়।

৪)সুস্থ হওয়া।

৫)বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া: খলীফা নির্বোধ মানসিক প্রতিবন্ধী, মস্তিষ্ক বিকৃত বা হাবাগোবা হবেন না তারা বৃদ্ধি, ভাষা, প্রতি বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হবেন না।কেননা পাগল , মস্তিষ্ক বিকৃত বা নির্বোধ মানুষ কোনো সাধারণ দায়িত্বও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে না।আল্লাহ তায়লা বলেন,

ولا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فيه

"নির্বোধ মালিকদের হাতে তোমাদের সে সম্পদ তুলে দিয়ো না, যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের দায়িত্বে দিয়েছেন ও তোমাদের জীবিকা লাভের অবলম্বন করেছেন।” (সূরা নিসা: ৫)। সাধারণ অর্থ-সম্পদের মালিকানা বুঝিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর এই নিষেধাজ্ঞা আরো বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, খিলাফতের মতো অতি দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধির বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৬)জ্ঞানী হওয়া:খিলাফত পরিচালনার জন্যে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দরকার। তা না হলে রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শের অনুসরণ সম্ভব হবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের ইসলামী অনুশাসন, বিধিবিধান, নীতি-আদর্শ ও সমকালীন অন্যান্য শাসনব্যবস্থাএবং ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে। তিনি শুধু কুরআন- হাদীস সম্পর্কেই জ্ঞান রাখবেন তা নয়, বরং কুরআন-হাদীসের আলোকে বিন্যস্ত অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, ফিকহ, কুরআন ব্যাখ্যার নীতিমালা, ইসলামের দণ্ডবিধি, সমকালীন অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার সাথে ইসলামের

স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বিস্তারিত ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হবেন। জ্ঞানহীন মানুষ খলীফা হতে পারবে না।

৭)স্থায়ী অধিবাসী হওয়া:খলীফা হওয়ার জন্যে ব্যক্তিকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেশের স্থায়ী অধিবাসী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَا يَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا "যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরাত করেনি, হিজরাত না করা পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।" (আনফাল: ৭২)। এর কারণ হলো, কেউ যদি রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী না হয় তার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র শাসন করার কোনো অধিকার জন্মায় না। সাধারণ মানুষও বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করে না।

৯. স্বাধীন হওয়া:খলীফা এমন ব্যক্তিই হতে পারবেন যিনি কোনো অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ নন। তিনি অবশ্যই মুক্ত ও স্বাধীন হবেন। তাহলেই তার পক্ষে দেশের লোকদের স্বাধীনতা ও মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। কেননা পরাধীন ব্যক্তি স্বাধীন লোকদের নেতা হলে তা গ্রহণীয় হবেনা।

১০)তাকওয়াবান হওয়া:তাকওয়া হলো আল্লাহভীতি

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশি আল্লাহ ভীরু, আল্লাহ তাছা নিকট সেই বেশি সম্মানিত।" (সূরা হুজুরাত: ১৩)।তাকওয়া হলো সকল সৎগুণের মূল।খলীফার মধ্যে তাকওয়া থাকলে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না। জনগণের হক নষ্ট করবেন না।

১১)আমানতদার হওয়া

১২)পদলোভহীন হওয়া:ক্ষমতালোভীরা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে যে কোনো অন্যায় করতে পারে। তাদের হাতে শাসনতন্ত্র নিরাপদ নয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

أنا والله لا تولى لأعمالنا هذا احدًا سأله او حرص عَلَيْه 'আলাহর কসম, আমরা এমন ব্যক্তিকে কখনোই আমাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করবো না, যে নিজেই পদ প্রার্থনা করে বা তার জন্যে লালায়িত হয়। (সুনান তিরমিযী)

১৩)ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া:আল্লাহ তায়লা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاس أن تحكموا بالعَدْلِ إِنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

"নিশ্চয় আল্লাহ আমানতসমূহকে সেগুলোর হকদারদের নিকট দিয়ে দেয়ার জন্য তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন। তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবে তখন তা করবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে উপদেশ দান করেন, তা কতই না উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছগ দেখেন ও শুনেন।"(নিসা:৫৮)

১৪)বিদআতের বিরুধী হওয়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

قال رسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ وَقرَةَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى

هدم الإسلام

"যে ব্যক্তি বিদআতপন্হি লোককে সম্মান করেন। সে ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে।" (সুনান আবু দাউদ)

১৫)অত্যাচারী না হওয়া।

১৬)ধনসম্পদের লোভ না থাকা

১৭)তাওয়াক্কুল সম্পন্ন হওয়া ইত্যাদি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর খলীফাগণ বা খুলাফায়ে রাশিদা:

‘আল জামি আল তিরমিযী’ তে বর্ণিত হয়েছে,মহানবী ﷺ বলেছেন, "তাঁর ইন্তিকালের পর খিলাফত ব্যবস্থা বহাল থাকবে তিরিশ বছর। এরপর তা রাজতন্ত্রে পরিণত হবে।” রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর মর্ম অনুসারে তাঁর ইন্তিকালের পর যাঁরা দীনি হুকুম-আহকামের ভিত্তিতে পরবর্তী তিরিশ বছর ধরে অভ্যন্ত যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মকুশলতাসহ বিশ্বজাহান শাসন করেছেন তারাই হলেন রাসূলুলাহ ﷺএর খলীফা। তারাই খুলাফায়ে রাশিদীন বা সঠিকপথের পাথক ও দিশারী প্রতিনিধি।

তাঁরা হলেন-

ক) আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবন কুহাফা সিদ্দীক (রা) ৬৩২-৩৪খ্রি.:

খ) আবু হাফস উমর বিন খাত্তাব আল ফারুক (রা) ৬৩৪-৬৪৪ খ্রি:

গ) আবূ আমর উসমান বিন আফফান (রা) ৬৪৪-৬৫৬ খ্রি. এবং

ঘ) আবূ তুরাব আলী ইবন আবী তালিব (রা) ৬৫৬-৬৬১ খ্রি।

অবশ্য ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ বিশেষত শীআ মতানুসারী ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, "খুলাফায়ে রাশিদার মোট সদস্য হলেন পাঁচজন। তাদের হিসাব অনুযায়ী উল্লিখিত চারখলীফার শাসনকাল রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষিত তিরিশ বছরের চেয়ে ছয়মাস কম ছিল। হাসান বিন আলী (রা)-এর ছয়মাসের শাসন এর সাথে যুক্ত করলেই কেবল এ মেয়াদ পূর্ণতা পায়। যে জন্য হাসান (রা)-কেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন খলীফা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উমাইয়া পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ এবং ইতিহাসের আধুনিক বিশেষকগণ উমাইয়া শাসক উমর বিন আব্দুল আযীযকে (৭১৭-৭২০খ্রি) খুলাফায়ে রাশীদার পঞ্চম সদস্য হিসেবে উলেখ করে থাকেন। তাঁর আদর্শ, কর্মনীতি ও জীবন দর্শনের আলোকে ঐতিহাসিকগণ তাকে এ কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু আসল কথা হলো ৬৩২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কালে রাসূলুলাহ ﷺএর যে চারজন সাহাবা (রা) ইসলামী খিলাফতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরাই হলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ. তাঁরা ছাড়া আর কেউ খুলাফায়ে রাশীদার সদস্য বলে গণ্য হবেন না।

খিলাফতের সফলতা:

ইসলামী খিলাফত, বিশেষত খিলাফতে রাশিদাহ, মানব ইতিহাসে একটি অনন্য ও সফল শাসনব্যবস্থার উদাহরণ। এটি একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে নেতৃত্ব পরিচালিত হয় এবং জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, এবং সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করার দিক থেকে খিলাফত অত্যন্ত সফল বলে বিবেচিত।

১**)** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:খিলাফতে রাশিদাহর শাসকরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। খলিফা উমর ইবনে খত্তাব (রা.)-এর সময়ে ন্যায়বিচারের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল যেখানে শাসক নিজেই আইনের অধীন ছিলেন। একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, এক ইহুদির সাথে তার সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের মীমাংসায় উমর (রা.) নিজেই একজন সাধারণ মানুষের মতো বিচারকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, খিলাফতে শাসক-শাসিতের মাঝে কোনো বৈষম্য ছিল না।

২**)**অর্থনৈতিক সফলতা:খিলাফতে রাশিদাহর অধীনে অর্থনৈতিক উন্নতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামল। তিনি যাকাত ব্যবস্থাকে কার্যকর করে দারিদ্র্য দূর করেছিলেন। এমনকি এক পর্যায়ে দারিদ্র্য এতটাই কমে গিয়েছিল যে, যাকাত গ্রহণ করার মতো কেউ পাওয়া যেত না। অর্থনৈতিক নীতিমালার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সম্পদের ন্যায্য বন্টন। ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

৩**)** প্রশাসনিক দক্ষতা:খিলাফতে রাশিদাহর অধীনে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দক্ষতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, অঞ্চলভিত্তিক গভর্নর নিয়োগ, এবং জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন এই ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। উমর (রা.) তাঁর গভর্নরদের সম্পদ ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিলেন এবং দুর্নীতির কোনো অভিযোগ উঠলে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন।

৪) সামরিক ও কূটনৈতিক সাফল্য:খিলাফতের অধীনে সামরিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়। মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধ জয় করে ইসলামি সাম্রাজ্যকে সুদূর প্রাচ্য থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত করে। তবে, এই বিজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দখল নয়, বরং ইসলামি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা। কূটনৈতিক সম্পর্কেও খিলাফত অত্যন্ত সফল ছিল। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর সাথে শান্তি চুক্তি এবং সমঝোতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা হয়েছিল।

৫) সামাজিক সমতা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা:খিলাফতের অন্যতম সাফল্য ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতা নিশ্চিত করা। বর্ণ, গোত্র, এবং জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। দাসমুক্তির প্রচারণা এবং নারীদের অধিকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ইসলামি খিলাফতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬) শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ:খিলাফতের অধীনে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা হয়। মুসলিম উম্মাহ জ্ঞানচর্চায় বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করে। বিশেষত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর শাসনকালে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ও দর্শনের ক্ষেত্রে মুসলিম পণ্ডিতরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

খিলাফতের বিলুপ্তি:

খিলাফতের পতন মূলত উসমানী খিলাফতের (Ottoman Caliphate) বিলুপ্তির মাধ্যমে ঘটে। এর প্রধান তারিখ এবং পটভূমি হলো–

খিলাফতের পতনের তারিখ:

৩ মার্চ ১৯২৪ – আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে অটোমান খিলাফত বিলুপ্ত করেন।

পতনের পটভূমি:

১.<u>উসমানী খিলাফত</u>:১৩০০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত উসমানী সাম্রাজ্য ছিল ইসলামী বিশ্বের শেষ প্রধান খিলাফত।

১৬০০ ও ১৭০০-এর দশকের মধ্যভাগে অটোমানরা ইউরোপ ও আরব অঞ্চলে বিস্তৃত ক্ষমতা ধরে রাখে।

৩. দুর্বলতার সূচনা:সাম্রাজ্যের ভেতর রাজনৈতিক দুর্বলতা, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, এবং পশ্চিমা সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির চাপে অটোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-1918): অটোমান সাম্রাজ্য জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেয়, যা তাদের পরাজয়ের কারণ হয়।

৩. সেভর চুক্তি (Treaty of Sèvres):১৯২০ সালে পশ্চিমা শক্তিগুলো (বিশেষত ব্রিটেন এবং ফ্রান্স) অটোমান সাম্রাজ্যের অঞ্চল ভাগ করে নেয়।

এর ফলে মুসলিম বিশ্বে খিলাফতের ঐক্যের ভিত্তি ভেঙে পড়ে।

৪. মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের ভূমিকা:১৯২৩ সালে আতাতুর্ক তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা পৃথক করেন।

১৯২৪ সালে খিলাফত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করেন।

খিলাফতের বিলুপ্তির প্রভাব:

১)মুসলিম বিশ্বের বিভক্তি:মুসলিম বিশ্বের একক নেতৃত্ব আর ছিল না, যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চল উপনিবেশ বা স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়।

২)ইসলামী পুনরুত্থানের আন্দোলন:১৯২৪ সালের পরে বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠন ও আন্দোলন আবার খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে শুরু করে।

মজলিশে শুরার পরিচয়:

মজলিসে শূরা হলো পরামর্শ পরিষদ এবং শাসন ও আইন প্রণয়নের জন্য গঠিত সভা। শব্দগত দিক থেকে শূরা বলতে যে কোনো রকমের পরামর্শকে বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু মজলিসে শূরা নিছক কোনো পরামর্শ সভা নয়। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের জন্য গঠিত এমন একদল লোকের সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ সভাকে মজলিসে শূরা বলা হয়, যাঁরা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে অসাধারণ দক্ষ, ইসলামী আইন উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণের তুলনাহীন প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তাদের এ প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা শরীআর সাথে সাংঘর্ষিক আইন প্রণয়নে ব্যবহৃত হয় না। **S B**

Chowdhury বলেন, "The parliament or 'majlis-e-shura shall comprise of one house known as the Islamic state assembly or house of the people in which subject to the previsions of the shariat and the sunnah on such matters of which guidance shall be available from the guidance council on Islamic affairs and the authority assigned to the constitutional and guardianship council shall be vested t legislative authority." (The Profile of an Islamic State)

মোটকথা, 'আইন প্রণয়ন, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ, শাসনকাজ পরিচালনা এবং বিচার কাজ সম্পাদনায় ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহযোগী একটি নির্বাচিত পরিষদই হলো মজলিসে শূরা। অবশ্য এ পরিষদ সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে না। সাধারণত তা কুরআন-সুন্নাহে বিবৃত আইনের ব্যাখ্যা দেয় ও প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ধারণ করে। তবে কখনো যদি এমন সঙ্কট দেখা যায় যার সুস্পষ্ট সমাধান কুরআন-সুন্নাহে বিবৃত হয়নি তখন শূরা সদস্য বিশেষজ্ঞ আলিমগণ, যোগ্যতাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্তঃ ব্যক্তিগণ উদ্ভূত সঙ্কট মুকাবেলায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নুতুন আইন উদ্ভাবন করেন। উদ্ভাবিত আইনসমূহ একান্তভাবে কুরআন-সুন্নাহসম্মত হয়। কোনোক্রমেই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন ও উদ্ভাবন সম্ভব নয়।

মজলিসে শূরা বলতে বুঝায় পরামর্শ সভা, মতবিনিময় পরিষদ ইত্যাদি। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনব্যবস্থায় এটি আইনসভার পরিপূরক। রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় তাকওয়াবান, জ্ঞানী এবং প্রকৃতই কর্তব্যনিষ্ঠ লোকদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। সদস্যদের আমানতদার, ন্যায়নিষ্ঠ ও পদলোভহীন হতে হয়। তাদের মধ্যে অর্থলোভ ও অস্থিরতা থাকে না। জন্মগতভাবে তারা হন পবিত্র ও বিদআতবিরোধী। তারা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানী ও আদর্শ মানুষ। সামাজিক মর্যাদায় তারা শীর্ষস্থানীয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক হন। উল্লিখিত গুণসমূহে বিভূষিত মুসলিমদের নিয়ে মজলিসে শূরা গঠিত হয়। শূরা সদস্যগণ সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁরা রাষ্ট্রপ্রধানকে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরামর্শ দেন। প্রয়োজন হলে তাঁর সংশোধনে ভূমিকা পালন করেন। নতুন

আইন উদ্ভাবন এবং প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে রেখে শূরা সদস্যগণ সুবিচার এবং সুশাসন নিশ্চিত করেন।

মজলিশে শুরার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

খিলাফত ব্যবস্থায় মজলিসে শূরার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিছু পয়েন্ট তুলে ধরা হলো–

১. মুসলিমদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য: পারস্পারিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করা মুসলিমদের অন্যতম জাতীয় বৈশিষ্ট্য। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

“যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়িম করে, তাদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে।" (সূরা শূরা ৩৮)।

২. রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ: আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মধ্যস্থতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক বিষয়ে কোনো নির্দেশ পেতেন না সে সকল বিষয়ে তিনি তাঁর সাহাবী (রা)-গণের সাথে পরামর্শ করতেন। পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো প্রজ্ঞা আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি পরামর্শ না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহাবী (রা)-দের সাথে পরামর্শ না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দেখিনি।"তাই রাসূলুল্লাহ ﷺএর পরামর্শ গ্রহণের এ কর্মপদ্ধতির অনুসরণে খিলাফত ব্যবস্থায় মজলিসে শূরা একটি অনিবার্য প্রয়োজনীয় উপাদান। কেননা ওহী নাযিল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদেশ দিয়েছেন,

وشاورهم في الأمر

"এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

৩. খিলাফতের অন্যতম উপাদান: উমর বিন খাত্তাব (রা) বলেছেন, "যে রাষ্ট্রে মুসলমানদের পরামর্শের ব্যবস্থা নেই, তা খিলাফত নয়।" বস্তুত কেবল স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনমত প্রকাশের সুযোগ না থাকার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রে এমন

ভাবনার ঠাঁই নেই। কেননা মজলিসে শূরার স্বাধীন মত প্রকাশের কেন্দ্র ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র গঠিতই হতে পারে না।

৪. ইসলামী শাসন-বিধানের তৃতীয় উৎস: কুরআন-সুন্নাহর পর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় শাসন-প্রণালী এবং বিধিবিধানের তৃতীয় উৎস হলো মজলিসে শূরা। আলী বিন আবু তালিব (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স)। যদি আমার সামনে এমন কোনো ঘটনা উপস্থিত হয় যার সম্পর্কে কুরআনের কোনো প্রকাশ্য নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি এবং সে সম্বন্ধে আপনার কোনো সুন্নাতও বিদ্যমান নেই, এ অবস্থায় আমরা কী করবো? মহানবী (স) ইরশাদ করলেন, 'পরস্পর পরামর্শ দিয়ে তোমরা সে বিষয় মীমাংসা করবে।'কাজেই মজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্রের আইনী উৎস হিসেবে তৃতীয় স্থান দখল করে আছে। মূলত কিয়াস ও ইজমার আইনসঙ্গত সংস্থা হলো মজলিসে শূরা।

৫. খিলাফতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সবোচ্চ ফোরাম:আনসার ও মুহাজিরদের এক সমাবেশে উমর বিন খাত্তাব (রা) বললেন, "যা সত্য ও সঠিক তা আপনারা নির্ধারণ করবেন। আমার মতের অনুকূলে বা প্রতিকলে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করুন। আমার ইচ্ছা এটা নয় যে, আপনারা শুধু আমার মতই সমর্থন করবেন। বস্তুত মজলিসে শূরা খিলাফতের শাসন ও আইন উদ্ভাবন কাজের সর্বশেষ আশ্রয়। এর সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে অথবা সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে যদি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে রাষ্ট্রপতিরও সাধ্য নেই সে সিদ্ধান্ত অমান্য করে। বরং খলীফসহ সকল স্তরের প্রশাসক এবং নাগরিকদেরকে তা মেনে নিতে হবে।

৬. কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ নির্মাতা: মজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের জন্য এমন শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাকর পরিবেশ নির্মাণ করে যে, তাতে তারা সহজে, শান্তিতে এবং আনন্দে বসবাস করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের শাসক ও কর্মকর্তারা হবে তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তি, তোমাদের ধনশালী লোকেরা হবে তোমাদের মধ্যে

সবচেয়ে বেশি দানশীল এবং সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে তোমাদের পরামর্শ কার্যকর হবে তখন জীবনে বেঁচে থাকা মৃত্যুর তুলনায় উত্তম হবে।"

৭. আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত: মজলিসে শূরার পরামর্শ আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত। একে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মনে রাখবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পরামর্শ করার মুখাপেক্ষী নন। তা সত্ত্বেও পরামর্শের এ বিধান আল্লাহ নাযিল করেছেন উম্মতের ওপর রহমত স্বরূপ। অতএব যে লোক পরামর্শ করবে সে সঠিক পথ কখনোই হারাবে না। আর যে লোক পরামর্শ করবে না সে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবে না।"

৮. দৃঢ়তা ও নির্ভরযোগ্যতা: বদর, উহুদ, খন্দক, তাবুক প্রভৃতি যুদ্ধ প্রাক্কালীন সময়ে মহানবী ﷺ সাহাবী (রা)-দেরকে একত্রিত করে বলেছিলেন, "আমার সাথীরা! আমাকে তোমরা পরামর্শ দাও।" কেননা পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তে সীমাহীন দৃঢ়তা ও নির্ভরযোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়। মহানবী ﷺইরশাদ করেন, "পারস্পারিক পরামর্শের চেয়ে দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য কোনো নীতি নেই, আর গভীর চিন্তা-ভাবনার মতো বুদ্ধিমত্তাও কিছু হতে পারে না।” কাজেই দৃঢ়তা ও নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তি হিসেবেও মজলিসে শূরার বিশেষ গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

৯. অভ্রান্ত নীতি নির্ধারক : মজলিসে শূরা অভ্রান্ত নীতি নির্ধারণের অবিকল্প উপায়। রাসূলুল্লাহ ﷺও মজলিসে শূরার অভ্রান্ততার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলেছেন, “যে পরামর্শ করে কাজ করে সে কখনোই লজ্জিত হয় না। বিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করাই হলো বুদ্ধিমত্তা।"

তাই খিলাফত সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা এবং তার দীনি চরিত্র অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থেই মজলিসে শূরা অস্তিত্বশীল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মজলিশে শূরার প্রকার

খিলাফত ব্যবস্থায় মজলিসে শূরার দুটি প্রকার লক্ষ্য করা যায়।যেমন,

ক) মজলিসে আম এবং

খ) মজলিসে খাস।

ক) মজলিসে আম: মজলিসে আম বা সাধারণ পরিষদ, নিম্ন পরিষদ। সাধারণভাবে মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা আছে এমন যে কোনো মুসলিম সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে মজলিসে আমের সদস্য হতে পারেন। শূরা সদস্যগণ নিজেরা সদস্য পদ প্রার্থনা করেন না বা নির্বাচিত হওয়ার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেন না। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদেরকেনির্বাচিত করেন। এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত দেশের সকল স্তর ও পর্যায়ের জনগণের প্রতিনিধিত্ব মজলিসে আমে থাকে। তারা প্রত্যেকে নিজস্ব অবস্থান থেকে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

খ) মজলিসে খাস: মজলিসে খাস বা বিশেষ পরিষদ, উচ্চ পরিষদ। মজলিসে আমের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকজনকে নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়। এঁরা রাষ্ট্রশাসন, আইন উদ্ভাবন, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি কাজে বিশেষ দক্ষ হয়ে থাকেন। তাঁর জাতীয়ভাবে সম্মানিত এবং স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব হন। সাধারণত তাঁরা মজলিসে আমের সদস্যদের মতামত ও সমর্থনে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। শাসন পরিচালনায় খলীফা সাধারণত মজলিসে খাসের সাথেই পরামর্শ করেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ তাদের মতামতের ভিত্তিতেই গ্রহণ করে থাকেন। মজলিসে আমের চেয়ে মজলিসে খাসের সদস্য সংখ্যা অনেক কম হয়ে থাকে। আধুনিক আইন পরিষদের সাথে মজলিসে আমকে এবং মন্ত্রী পরিষদের সাথে মজলিসে খাসকে তুলনা করা যায়। অবশ্য মূলনীতি ও আদর্শিক কারণে এতদুভয়ের মধ্যেও প্রণিধানযোগ্য বিভিন্ন পার্থক্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

গঠন পদ্ধতি:

মজলিসে শূরা হবে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ। তাই এর সদস্যদেরকে অবশ্যই অধিকাংশ মানুষের ভোটে, অবাধ ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হতে হবে। সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে

যে সকল মূলনীতি অনুসরণ করা হবে, তাহলো, সর্বাধিক ধার্মিক ও তাকওয়াবান লোককে নির্বাচিত করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إن أكرمكم عند الله أتقاكم إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।" (সূরা হুজুরাত: ১৩)

তাকওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তিকে অবশ্য পদের প্রতি লোভহীন হতে হবে। মজলিসে শূরা গঠনে তাই পদের প্রতি লোভহীন মানুষকে নির্বাচিত করা অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

انا والله لا تولى

لأعمالنا هذا احدًا سأله او حرص عليه

"আল্লাহর শপথ, আমরা সে ব্যক্তিকে কোনো পদে অভিষিক্ত করি না, যে শামী রাষ্ট্র ও পদ প্রার্থনা করে।" কারণ হলো, যাদের পদের প্রতি লোভ থাকবে, তারা বিভিন্ন ট্রেনার প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে এই পদ ও পদবী ব্যবহারের দুরভিসন্ধি পোষণ করেন। এমনকি পন্ন কেড়ের সমন্বয়ে লাভের জন্য নানা ষড়যন্ত্র ও অবৈধ পদ্ধতি ব্যবহারেও তারা পিছপা হন না। মজলিসে শূরা গঠনের ক্ষেত্রে তাই এই মূলনীতি দুটো একান্তভাবে অনুসৃত হবে। আর এ দুটি নীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচন কমিশন সময় ও পারিপার্শ্বিকতা মূল্যায়ন করে অন্যান্য নীতিমালা তৈরি করবে।

প্রকৃতি:

মজলিসে শূরা একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সংসদ বা আইন পরিষদ। এটা ইসলামী বিধানে বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন সর্বসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত লোকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এটা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত পরিষদ নয়। এর কোনো সদস্যই বংশীয় আভিজাত্য অথবা আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়ে নির্বাচিত হন না। বরং ইসলাম আরোপিত শর্তপূরণ করেই এর সদস্যগণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

ইসলামের নির্দেশনার আলোকে তারা স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করেন। কোনো ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারকে প্রাধান্য দেয়া হয় না।
মজলিসে শূরায় প্রতিজন সদস্য স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। তারা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করেন। তারা প্রতিটি সৎকাজের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং কোনো ক্ষেত্রেই প্রকৃত সত্য গোপন করেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتَّقُوا الله إن الله شديد العقاب "ভালো কাজ করা ও তাকওয়া অবলম্বনে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।" (সূরা মায়িদা : ২)। এ আদেশ বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) সবসময় সত্যের পক্ষে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "সত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি হলো বোবা শয়তান।"
মজলিসে শূরায় দলবদল, দলাদলি, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা, সরকারি দল, বিরোধী দল ইত্যাদি কোনো ব্যাপার নেই। এখানে কুরআন-হাদীসের মূলনীতি অনুসারে নতুন আইন উদ্ভাবন ও মূল্যায়ন করা হয়।

মজলিশে শূরার কার্যাবলি:

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যবস্থায় মজলিসে শূরা অত্যন্ত প্রভাবশালী আইনগত প্রতিষ্ঠান। কতিপয় যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন নির্বাচিত মুসলিম ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এর কার্যাবলির ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত পরিচালনা নির্ভর করে। এখানে মজলিসে শূরার কার্যাবলি তুলে ধরা হলো।
১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ :মজলিসে শূরার প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র তৈরি, রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন প্রণয়নসহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ করা। খলীফা বা যে কোনো পর্যায়ের শাসক আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা বা অন্যকোনো পর্যায়ে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেন আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোনো ধরনের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে মজলিসে শূরা তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।

২. মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা: ইসলামী রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের শাসন, আইন প্রণয়ন, পরিচালনা, কর্মপদ্ধতিসহ সকল ক্ষেত্রে তাই মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মজলিসে শূরা সকল পর্যায়ে মুসলিম ঐতিহ্য, চেতনা, আদর্শ, জীবন দর্শন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

৩. ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন :মজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন প্রবর্তন নিশ্চিত করবে। ব্যক্তির ইচ্ছা বা ইসলাম অসমর্থিত কোনো আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারবে না। কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ার পরও যদি শাসননীতি ইসলামী না হয় তাহলে সে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হয় না।

৪. আইন প্রণয়ন: মজলিসে শূরা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করবে। তবে তাদের আইন প্রণয়নে কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে না। বরং আল-কুরআন ও সুন্নাহে বিবৃত মূলনীতির আলোকে যে সমস্যার সরাসরি সমাধান পাওয়া যাবে না, সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে এই সংস্থা।

৫. বিবাদ-বিসম্বাদ রোধ: মুসলিম জাতি বা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে নানা কারণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। স্বার্থকেন্দ্রিক এ সকল দ্বন্দ্ব যেন জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে কোনো রকমের বিরূপ প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করার জন্য মজলিসে শূরা কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে সর্বোচ্চ সুনীতি ও ন্যায়বিচারের সাথে বিবাদ বিসম্বাদ রোধ করবে। মুসলিমদের মধ্যে শত্রুতা, কলহ বা ঝগড়াকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে জিইয়ে রাখবে না।

৬. ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ :ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির আলোকে মজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সংরক্ষণ করবে। কেউ যেন কারো ধর্ম পালনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, কারো ধর্মীয় ক্ষেত্রে কেউ যেন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করে বরং স্বাধীনভাবে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা এ সংস্থার প্রধানতম কাজ।

৭. ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ :আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কারো অধীন নয়। সে কেবল আল্লাহ এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অধীন। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে যেন ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন না হয়, সে যেন স্বাধীনভাবে চলতে পারে, বসবাস ও কাজ করার অধিকার পায় তা নিশ্চিত করা মজলিসে শূরার অন্যতম প্রধান কাজ।

৮. বাক-স্বাধীনতা সংরক্ষণ :মজলিসে শূরা ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত কথা বলার অধিকার সংরক্ষণ করবে। কেননা ইসলাম মানুষকে ন্যায়সঙ্গত কথা বলার অধিকার দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) যালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলাকে বড় জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি সত্যপ্রকাশে ভীতসন্ত্রস্ত লোকদের বোবা শয়তান আখ্যা দিয়েছেন। কাজেই মজলিসে শূরা ব্যক্তির কথা বলার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না।

৯. বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ: প্রশাসন ও নির্বাহী বিভাগ কোনো রকমের ক্ষমতা ব্যবহার করে বিচার বিভাগ এবং বিচার-কার্যকে যেন প্রভাবিত করতে না পারে মজলিসে শূরা তা নিশ্চিত করবে। ধনী, গরীব, ছোট, বড়, মুসলিম, অমুসলিম, সাদা, কালো নির্বিশেষে সকল মানুষ যেন সুবিচার পেতে পারে মজলিসে শূরা সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করে তার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

১০. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ : রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, "আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবের ওপরও আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং তোমরা সকলে আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে তৈরি।" কাজেই মজলিসে শূরা সমাজের সদস্য এবং আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সকল মানুষের মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

১১. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নির্ধারণ: কুরআন সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কী হবে তা নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা নিশ্চিত করা মজলিসে শূরার কাজ। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বাইরে যেয়ে নীতি নির্ধারণ করার এখতিয়ার মজলিসে শূরার নেই। তাদের উদ্ভাবিত নীতি ও পদ্ধতিটি একান্তভাবে কুরআন-সুন্নাহসম্মত হতে হবে। কোনোভাবেই এর ব্যতিক্রম বা অন্যথা হতে পারবে না।

১২. জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন মানুষের মৌলিক অধিকার। মজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ অধিকার পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সকল কর্মসূচিই যে মজলিসে শূরাকে বাস্তবায়ন করতে হবে, তা নয়। বরং এর নির্দেশনা ও সুপারিশে যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি গোষ্ঠী এ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

১৩. জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ: ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো পর্যায়ের শাসক বা কর্মকর্তাই জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়। খলীফা থেকে শুরু করে যে কোনো শাসক, প্রশাসক ও কর্মকর্তার কাছে তার কাজের জবাবদিহি চাওয়ার ক্ষমতা মজলিসে শূরার রয়েছে। কাজেই এ সংস্থা কাউকে ইসলাম অসমর্থিত কোনো কাজ করতে দেখলে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। কেউ যেন শাসন কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী না হতে পারে জবাবদিহিতা গ্রহণের মাধ্যমে মজলিসে শূরা তা নিশ্চিত করবে।

১৪. সম্পদের সুষম বন্টন: ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তি যেন সম্পদের পাহাড় গড়ে শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে অসংখ্য লোককে নিঃস্ব করতে না পারে মজলিসে শূরা তা নিশ্চিত করবে। বিশেষত যাকাত, সাদাকাহ, উশর, খারাজ প্রভৃতি উৎসগুলোর অর্থ আদায় নিয়মিত করে এ সংস্থাটি রাষ্ট্রের দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে।

১৬. খলীফাকে সাহায্য করা :মজলিসে শূরা শাসন-কাজ পরিচালনায় খলীফাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। কোনো ক্ষেত্রে খলীফা যদি ভুল করে তাহলে তাকে সংশোধন করে

দেবে। খলীফার কার্যাবলি নিবীড়ভাবে তত্ত্বাবধান করবে। যে কোনো অসুবিধায় তাকে পথ বলে দেবে। কোনোভাবেই খলীফাকে ইসলাম বিরুদ্ধ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বা কোনো আইন চালু করতে দেবে না। সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার পর যদি খলীফা সংশোধিত না হয় প্রয়োজনে তাকে পদচ্যুত করে খিলাফতকে সাহায্য করাও মজলিসে শূরারই কাজ।

১৭. নতুন আইন উদ্ভাবন করা মজলিসে শূরা কোনো আইন রচনা করে না। আইন রচনা করার কোনো অধিকার বা ক্ষমতা এ প্রতিষ্ঠানের নেই। তবে এ সংস্থাটি আল-কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী আইনের অপরাপর উৎসগুলোর আলোকে নতুন নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন উদ্ভাবন করতে পারে। নতুন আইন উদ্ভাবন ছাড়া রাষ্ট্রের গতিশীলতা ও পরিচালনা অসম্ভব বলে এ দায়িত্ব পালনে মজলিসে শূরা কোনো অবহেলা প্রদর্শন করতে পারবে না।

১৮. আইন বিন্যস্ত ও গ্রন্থাবদ্ধকরণ: মজলিসে শূরা উদ্ভাবিত বিভিন্ন আইন যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখে না। বরং সময়, পরিবেশ ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় উদ্ভূত হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধানসমূহকে বই আকারে প্রকাশ করে, আইনসমূহ সাধারণ মানুষের উপযোগী করে সাজায়। যাতে করে তারা সহজে এ সকল আইন বুঝতে ও মেনে চলতে পারেন। আইন বুঝতে না পেরে কেউ যদি তা না মানে বা ভুল করে তাহলে তাকে দায়ী করা যায় না।

১৯. প্রশাসকদের তত্ত্বাবধান করা: ইসলামী রাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক সুবিধা নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে প্রাদেশিক শাসক নিয়োগ করে। তাছাড়া এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। মজলিসে শূরা সকল প্রকার প্রশাসকদের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করে। কোনো প্রশাসক ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ করলে বা শাসন ক্ষেত্রে ইসলাম অসমর্থিক কোনো কিছু চালু করতে চাইলে মজলিসে শূরা তাকে সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সংশোধন সম্ভব না হলে প্রয়োজনে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কাজেই মজলিসে শূরার সক্রিয় থাকার ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত ইসলামী চরিত্রে বহাল থাকা নির্ভর করে। এ সংস্থাটি যদি তার কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করে তাহলে এ রাষ্ট্র তার কার্যক্রম ইসলামের হুকুম-আহকাম অনুসারে করতে বাধ্য হয়। আর এ সংস্থাটি দায়িত্ব পালন না করলে রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হতে বাধ্য।

সংসদ ও মজলিসে শূরার তুলনা:

খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনায়ক আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, 'Democracy is a government of the people, by the people and for the people আর সংসদীয় গণতন্ত্র হলো, 'Cabinet government is the system in which the real executives the cabinet ministry and legally responsible to the legislature or brunches of it for is political policies and act and immediately or intimately responsible to the electorate; which the utular or nominal executive the chief of state occupies a position of irresponsibility.' (Dr. Garner)

সহজভাবে বলা যায়, সংসদীয় গণতন্ত্র হলো জবাবদিহিতামূলক সরকার যেখানে শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রীসভা শাসন-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এ পদ্ধতিতে নামে মাত্র রাষ্ট্রপতি থাকেন কিন্তু ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রীসহ তার মন্ত্রীসভার হাতে। নানা দিক বিবেচনায় সংসদীয় গণতন্ত্রের আইন পরিষদ বা সংসদ এবং মজলিসে শূরার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এখানে পদ্ধতি দুটোর ওপর তৌলনিক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।
১. ধর্ম: সংসদীয় গণতন্ত্রে ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একে যেমন অনিবার্য মনে করা হয় না, তেমনি কেউ যদি ধর্মীয় জীবনযাপন করতে চায় তাকে বাধাও দেয়া হয় না।
পক্ষান্তরে, মজলিসে শূরায় ধর্ম কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এখানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম এক অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয় বিষয়। যে জন্যে ধর্মীয় নির্দেশেই শূরা ব্যবস্থায় মানুষ পরামর্শ দিয়ে থাকে, পরামর্শ গ্রহণ করে এবং আনুগত্য করে ধর্মেরই

নির্দেশনায়। আল্লাহ বলেন, "মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার আমীরের আনুগত্য কর।" (নিসা: ৫৯)

২. পারস্পারিক মতবিরোধ :সংসদীয় গণতন্ত্রে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের পারস্পারিক বিরোধ দেখা দিলে যে কোনো উপায়ে তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ গুরুত্ব পায় না।

পক্ষান্তরে, মজলিসে শূরায় সকল মতভেদ-মতবিরোধ ইসলামের দেয়া ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা অনুসারে নিরসনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, "এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট সমর্পণ কর।" (সূরা নিসা: ৫৯)

৩আইন প্রণয়ন: সংসদীয় গণতন্ত্রে দেশ শাসন ও পরিচালনার জন্য সংসদ যে কোনো আইন রচনা করার অধিকার রাখে। এ ব্যবস্থায় সংসদ রচিত আইনই চূড়ান্ত। ধর্ম তাকে বৈধ বলুক বা না বলুক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বরং সংসদের স্বীকৃতি ও সম্মতিই যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে, মজলিসে শূরার আইন প্রণয়নের কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহর আইনের আলোকে শূরা সদস্যগণ কেবল নতুন নতুন আইন উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন। আল্লাহ রাসূলের আইন পরিপন্থি কোনো

বিষয়ে নতুন করে আইন রচনার ক্ষমতা তাদের নেই।

৪. সার্বভৌমত্ব: সংসদীয় গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হলো সংসদ। কখনো কখনো এ ক্ষমতার মালিক হয় জনগণ। তবে প্রকৃত ক্ষমতা শাসকগোষ্ঠীর প্রধানের হাতেই কুক্ষিগত থাকে।

পক্ষান্তরে মজলিসে শূরায় সার্বভৌম ক্ষমতার নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র অধিপতি হলেন আল্লাহ তা'আলা। কুরআন মাজীদে এসেছে, "আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক।"

৫. সংস্কৃতি: সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনাচারে গণ-ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। এ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত বা শোভন-সুন্দর করার কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় না। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা নীতি নৈতিকতা ও শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে দেশে নৈতিক অবক্ষয় ও পাপাচার রোধে রাষ্ট্র ও সরকারের কোনো কিছু করার থাকে না। রাষ্ট্র বরং এই অনাচারকেই সমর্থন করে।
পক্ষান্তরে, মজলিসে শূরায় এর কোনো সুযোগ নেই। কেননা এখানে ইসলামের কঠোর নৈতিক অনুশাসনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। মানুষের অনৈতিক ইচ্ছার পরিবর্তে মানবিক ইচ্ছাগুলোর বিকাশ ও লালন
নিশ্চিত করা হয়।

৬. অর্থনীতি: সংসদীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাধারণত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এ অর্থব্যবস্থার প্রচলন দেশের সকল আর্থিক ক্ষমতা সীমিত সংখ্যক বাক্তির নিকট কুক্ষিগত করে রাখে।
কিন্তু শূরাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় অবাধ অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের পথে হালাল-হারামের প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা হয়েছে। যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সুষম অর্থনৈতিক বন্টন চালু রাখা হয়েছে।

৭.দলবল ও দলাদলি: সংসদীয় ব্যবস্থায় দলবদল ও দলাদলি, আন্ত দেলীয় কোন্দল এক অনিবার্য বিষয়। কিন্তু মজলিসে শূরায় এরকম ব্যাপার চিন্ত াও করা যায় না। বরং এ ব্যবস্থায় সকলে আল্লাহর আদেশ মেনে ঐক্যবদ্ধ থাকেন। আল্লাহ বলেন, "তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

৮. সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক: সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার ওবিরোধী দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব এক শাশ্বত সত্য। অনেক ক্ষেত্রে শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নীতিতেও বিরোধিতা করা হয়। মজলিসে শূরায় এ ব্যাপার অকল্পনীয়। কেননা এখানে প্রথমত তেমন কোনো বিরোধী দলই থাকে না। দ্বিতীয়ত কোনো ক্ষেত্রে যদি দীনি স্বার্থে বিরোধিতা ও

সংশোধনী প্রয়োজন পড়ে তাহলে তা কুরআনী হুকুম মেনেই করা হয়ে থাকে। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করার রীতি শূরা ব্যবস্থায় থাকতে পারে না।

৯. আইন প্রণয়নের: সীমা সংসদীয় ব্যবস্থায় যে কোনো প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য একমত হলেই তা আইনে পরিণত হবে। যেমন সদস্যগণ সকলে যদি মনে করেন দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মদপান বৈধ করা হবে তাহলে তা বৈষ বলে পরিগণিত হবে। তারা যদি বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে অন্যায় মনে না করেন, তা অন্যায় বলে গণ্য হবে না। এমনকি আইনগতভাবে সমকামিতার বৈধতাও তারা দিতে পারেন। বর্তমান বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলোর দিকে তাকালেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মজলিসে শূরায় এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। এমনকি যে বিষয়টি কুরআন-হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে পৃথিবীর তাবত মানুষ একমত হলেও তাকে কোনোভাবেই হালাল করা যাবে না। শূরার আইন প্রণয়নের সীমা ইসলামী শরীআহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

১০. প্রার্থিতা: সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রার্থিতা একটি অনিবার্য ব্যাপার। এখানে সকল পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য প্রার্থী, প্রচারণা, বিপক্ষের বিরুদ্ধাচারণ ও ভাবমূর্তি বিনষ্টের জন্য মিথ্যাচার ও কুৎসা রটনা এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু মজলিসে শূরায় পদপ্রার্থিতা হলো সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, "আল্লাহর কসম। আমরা তাকে কোনো পদে নির্বাচিত করি না যে পদ প্রার্থনা করে।"

১১. সরকার গঠন পদ্ধতি: সংসদীয় সরকারে আইনসভার সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মজলিসে শূরার সরকারে সাধারণত শূরা সদস্যগণই এ দায়িত্ব পালন করে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শূরার উচ্চতম স্তর বা মজলিসে খাস ভূমিকা পালন করে।

১২.জবাবদিহিতা: সংসদীয় সরকারে সাংসদদের সংসদে জবাবদিহি করতে হয়। জনগণ বা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চেতনা এখানে ক্রিয়াশীল থাকে না। অপরদিকে মজলিসে শূরা সরকারের সকল পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের কাছে এবং আখিরাতে আল্লাহ

তা'আলার নিকট জবাবদিহিতার সুতীব্র অনুভূতি নিয়ে কাজ করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "সাবধান। তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১৩. রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন: সংসদীয় সরকারে যেমন সাংসদদের ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন শূরাভিত্তিক সরকারেও তেমনি মজলিসে শূরার সদস্যদের পরামর্শে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

১৪. নির্বাহী ক্ষমতা: সংসদীয় সরকারে নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হন প্রধানমন্ত্রী, আর মজলিসে শূরা রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হন আমীর বা রাষ্ট্রপতি।

১৫. নীতিগত ভিত্তি: গণইচ্ছা পরিবর্তনশীল বলে সংসদীয় গণতন্ত্রে স্থায়ী ও স্বচ্ছ নীতিতে শাসন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু শূরাভিত্তিক শাসনে মৌলিক নীতিমালা আল্লাহপ্রদত্ত বলে স্থায়ী ও সুদৃঢ় নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে।
১৬. জনকল্যাণমূলক আইন উদ্ভাবন: সংসদীয় গণতন্ত্রে সাংসদরা জনকল্যাণমূলক আইন উদ্ভাবনে বাধ্য নয় কিন্তু শূরা সদস্যগণ কুরআন-সুন্নাহ থেকে আইন উদ্ভাবনে বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

বস্তুত দু-একটি ক্ষেত্রে মিল থাকলেও আদর্শ, উদ্দেশ্য, দর্শন, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মপদ্ধতি এবং কর্মপরিধির দিক দিয়ে সংসদ এবং মজলিসে শূরার মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। আর এ পার্থক্য থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, জনকল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংসদের চেয়ে মজলিসে শূরাই অধিকতর কাথকর এবং বাস্তবসম্মত। কাজেই মুমিনের জন্য শূরাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

খলীফা নির্বাচন পদ্ধতি:

খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি ইসলামি শরীয়াহ ও ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত। এর উদ্দেশ্য হলো একজন ন্যায়পরায়ণ এবং যোগ্য নেতা নির্বাচন করা, যিনি উম্মাহর নেতৃত্ব দেবেন এবং শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন করবেন।

খিলাফতে নির্বাচন পদ্ধতি বহুমুখী। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি, ১. সাক্ষ্য প্রদান ২. সুপারিশ ৩. প্রতিনিধিত্বের সনদ প্রদান। অর্থাৎ কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া মানে ওই প্রার্থী ভালো এবং যোগ্য বলে আপনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি ভালো এবং যোগ্য বলে আপনি সুপারিশ করছেন। তিনি ভালো এবং যোগ্য বলে আপনি তার প্রতিনিধিত্বের বৈধতার সনদ প্রদান করছেন।ইসলামি খেলাফত পদ্বতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য শুধু নির্বাচন কিংবা ভোট নয়। নেতা, জনপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্বতি বহুবিধ। যেমন, নেতা কর্মীর দ্বারায়-জনপ্রতিনিধি জনগণ দ্বারায় নির্বাচিত হওয়া,শরিয়ার বিষয়বস্তু মানা ও "শূরা"(পরামর্শ) অনুশীলন ইত্যাদি।সরকার প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ ইসলামে কয়েকটি পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়।

যথা-(১) পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফার মনোনয়ন। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ তার পরবর্তী খলীফা হিসেবে হযরত ওমর রাঃ কে মনোনীত করে যান। উম্মতের সর্বসম্মত মতে এটা জায়েজ। তবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে এটা করেছিলেন।

(২)খলীফা তার পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য বিশেষ জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে দিয়ে যেতে পারেন, যেমন হযরত ওমর রাঃ তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করে দিয়ে যান। (৩)খলীফা তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের বিষয়টি জনগণের উপর ছেড়ে দিয়ে যাবেন। তারপর জনগণই তাদের খলীফা নির্বাচিত করবে। যেমন হযরত উসমান রাঃ তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি পরবর্তীদের উপর ছেড়ে দিয়ে যান। পরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে হযরত আলী রাঃ কে খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। তবে মু'য়াবিয়ার সময়ে এসেই এই ধারাহিকতার অপমৃত্যু ঘটে। উল্লেখিত পদ্বতিটি কিন্তু

সাহাবায়ে কেরাম প্রচলন করেন। সরাসরি রাসূলে কারীম রাউফুর রাহীম মুহাম্মদু রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত না।

গণতন্ত্র

সংজ্ঞা:

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Democracy। এটি Demos ও Kratos দুটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রিক শব্দ 'Demos' অর্থ হলো জনগণ এবং 'Kratos' অর্থ হলো শাসন বা কর্তৃত্ব। সুতরাং Democracy-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো জনগণের শাসন বা কর্তৃত্ব। প্রাচীনকালে গ্রিসের এথেন্স নগরীতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। গ্রিক ঐতিহাসিক থুসাইডিডেস (Thucydides) পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাসে 'গণতন্ত্র' শব্দটি উল্লেখ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotus) গণতন্ত্র প্রসঙ্গে 'বহুজনের শাসন' এবং 'সমাজে সমঅধিকার'-এর কথা বলেছেন। এ সময় ক্লিওন (Cleon) নামে অন্য একজন গ্রিক পণ্ডিত গণতন্ত্রকে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে পরবর্তীকালে গ্রিক দাশনিক প্লেটো-এরিস্টটলের আমলে গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। এ সময় গণতন্ত্র বলতে 'জনগণতন্ত্র' (Mobocracy)-কে বোঝানো হতো এবং তা নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতো। বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক পেরিক্লিস (Pericles)-এর মতানুসারে, যেখানে সরকারি কর্মচারীগণ গুণগত বিচারে নিযুক্ত হয় এবং আইনানুসারে সকলে সমান মর্যাদা লাভ করে, তা-ই হলো গণতন্ত্র। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে ও কালে গণতন্ত্রের ধারণার প্রভূত বিকাশ ঘটে। শব্দগতভাবে গণতন্ত্র বলতে গণ মানুষের নীতি বা আদর্শকে বুঝায়। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র হলো এমন একটি মতবাদ যেখানে জনগণের মাতের প্রাধান্য থাকে। অনেকদিন থেকে গণতন্ত্র এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। সময়ের কেবল। এক ধরনের সরকারকেই বুঝায় নাবিরা এর সাথে সাথে এক গণতন্ত্র কেরনের সমাজব্যবস্থাকেও বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদও সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস বলেছেন, "গণতন্ত্র এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোনো শ্রেণী বা শ্রেণী গোষ্ঠীর ওপর ন্যস্ত থাকে না, বরং সমাজের সাধারণ সদস্যগণের ওপর ব্যাপকভাবে ন্যস্ত থাকে।"

লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "যে শাসনব্যবস্থায় জনসমষ্টির তিন-চতুর্থাংশের মতানুসারে শাসন কাজ পরিচালিত হয় তাকে গণতন্ত্র বলে।" এ ক্ষেত্রে তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, মতামতদাতা জনগণের ভোটের শক্তি হবে তাদের শারীরিক শক্তির সমান।

খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এফ স্ট্রং-এর মতে, "শাসিত জনতার সক্রিয় সম্মতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে।"

ম্যাকাইভারের মতে, "যে শাসনব্যবস্থায় সরকার হলো গণমানুষের এজেন্ট এবং যে শাসনব্যবস্থায় জনগণ সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে তাকে গণতন্ত্র বলে।"

স্যার ক্রিপসের মতে, "গণতন্ত্র হলো এমন শাসনব্যবস্থা যেখানে প্রতিজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সকল বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করতে পারে এবং সকলের মধ্যে নিজের মত প্রকাশ করতে পারে।"

বিয়াট্রিস ওয়েবের মতে, "কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকার সকল মানুষের সংঘ যখন রাজনৈতিক আত্মশাসনের অধিকার ভোগ করে তখন তাকে গণতন্ত্র বলা যায়।”

এসব সংজ্ঞার মোদ্দাকথা হলো, সাধারণত গণতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে শাসন জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল এবং বিভিন্নভাবে সরকারের কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি মেলে। আধুনিককালে গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯-১৮৬৫)। তিনি ১৯ নভেম্বর ১৮৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের Pennsylavania state-এর গেটিসবার্গ নামক স্থানে এক বক্তৃতায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "Democracy is a Government of the people, by the people, and for the people." অর্থাৎ "গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সরকার এবং জনগণের (কল্যাণের) জন্য সরকার।"" ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে সংজ্ঞাটি প্রদান করার পর থেকেই এটি গণতন্ত্রের একটি সর্বজনীন ব্যাখ্যা হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে।

গণতন্ত্রের অবশ্য বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে সাথে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কথাও বলা হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক গণতন্ত্র যেমন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ:

প্রাচীন যুগ:

গণতন্ত্র প্রথম উদ্ভাবিত হয় গ্রীসের এথেন্সে ৫০৮ খ্রিষ্টপুর্বাব্দ যা ছিল মুলত নগর রাষ্ট্রেটির রাজনৈতিক দর্শনের ফসল। এথেন্সের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে আবর্তীত হয়। এগুলো ছিল ১) বিদ্যমান সরকারি প্রশাসন, বিচার আদালত ও শাসন সভায় সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণ। ২) কোন নারী, দাস, বিদেশী, নিজস্ব ভুমিহীন ব্যক্তি এবং অনুর্দ্ধ্ব ২০ বছর বয়সের কোন পুরুষ নাগরিক বলে বিবেচ্য না হওয়া। মোট জনগণের কেবল ৭ শতাংশ এর ফলে জনগণ হিসেবে গণ্য হত যাদের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক। জনগণের অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় বলেই এথেন্সের গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ছিল। এটি প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণ ছিল যে নগর রাষ্ট্রের নাগরিকেরা সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করত। খ্রিষ্টপুর্ব ৭০০ অব্দে স্পার্টায় ৩০ বা তদুর্দ্ধ্ব বছর বয়সের পুরুষদের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এপেলা নামক একটি মাসিক জনসমাবেশে এথেন্সের জনগণ নম্বর দিয়ে অথবা চিৎকার করে কোন প্রতিনিধির পক্ষে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করত যা পরবর্তীতে এরিস্টটল কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। তবে স্পার্টা এটি গ্রহণ করার পেছনের কারণ ছিল নির্বাচন সংক্রান্ত অসংগতি সমূহ দূর করা। রোমান সাম্রাজ্যের মোট জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশই নাগরিক বলে বিবেচিত হত এবং প্রতিনিধি নির্বাচনে অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব ছিল স্পষ্ট। রোমান প্রজাতন্ত্র ছিল ইউরোপের প্রথম প্রজাতন্ত্র যদিও সেটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছিল না। তা সত্বেও রোমান সরকার কাঠামো পরবর্তী যুগগুলোতে গণতন্ত্রের বিকাশে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলো গ্রীসের চেয়ে রোমান মডেলকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

মধ্য যুগ:

মধ্যযুগে ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলই সামন্তপ্রভু ও পাদ্রীদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। অনেক নগর রাষ্ট্র সে সময় মেয়র বা ধনী নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। সামন্তবাদী সরকার কাঠামোর অবলুপ্তি সাধনে নগর রাষ্ট্র ও শিল্প-বাণিজ্যিক কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তত্কালীন নির্বাচন ও সরকার ব্যবস্থাগুলো কতগুলো নিয়ম-নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হত। এই নগর রাষ্ট্রগুলো ইউরোপে বিশেষ করে ইতালীয় উপদ্বীপ অঞ্চলে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর ফলে বিজ্ঞান চর্চায় অধিকতর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ক্যাথলিক চার্চের অত্যাচারের মুখে প্রটেসটান্ট ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। কেননা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকরা ও গণতন্ত্রের বিরোধীতা করার মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখই ছিল ক্যাথলিক চার্চের উদ্দেশ্য। প্রটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলন ছিল ইউরোপের খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে লড়াই করে যাওয়ার বার্তা স্বরুপ। চার্চের বিরুদ্ধে এ ধরণের আলোচনা ও সমালোচনা গণতন্ত্রে উন্নয়ণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক যুগ:

বর্তমান আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনেই সমগ্র বিশ্ব গণতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। ব্রিটেনের পুরিটান নামক এক খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ১৬২০ সালে আমেরিকান কলোনির নিউ ইংল্যান্ডে যে স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিল তা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিল অফ রাইটস পাসের পর ব্রিটেন নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এটি ব্রিটেনের গণতন্ত্রকে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অধিক মর্যাদা প্রদান করে। একদিকে প্রটেস্টান্টরা ইউরোপে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল প্রভাব বিস্তার করছিল, অপরদিকে রোমের গির্জার জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে ধর্মের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট খ্রিষ্টানরা সপ্তদশ শতাব্দীতে গির্জার বিরুদ্ধে মানবাধিকারের নামে একটি আন্দোলন শুরু করে। যাকে তারা 'এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন' (Enlightenment Movement) বলে থাকে। এই আন্দোলনের দার্শনিকরা মানবীয় বিবেকের ভিত্তিতে খ্রিষ্টান ধর্মকে অস্বীকার করে বসে। (১৭৮৯ সালের ৪ জুলাই

'ফরাসি বিপ্লব' (French Revolution) হয়। যার ফলে গির্জা ও বাদশাহদের ক্ষমতা শেষ হয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়)। এরপর থেকে আস্তে আস্তে পুরো ইউরোপে গণতন্ত্রের আওয়াজ উঁচু হতে শুরু করে। ১৮৮৪ সালে ফ্রান্স সার্বজনীন পুরুষ ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় যা ছিল ১৭৮৯ এর ফরাসী বিপ্লবেরই ফসল। ১৭০৭ সালে ব্রিটেনের প্রথম পার্লামেন্ট গঠিত হলেও এটি নির্বাচন করতে পারত মোট জনসংখ্যার কেবল ৩ শতাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে। উপনিবেশিক আমলে আমেরিকাতে কেবল তারাই নাগরিক হিসেবে গণ্য হত যারা ছিল পুরুষ ভূস্বামী। এসময়ই সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি আমেরিকাতেও দাস প্রথার বিরোধীতা শুরু হতে থাকে। ১৮০৭ ও ১৮৩২ সালে দুটি পৃথক আইন ও তার সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে ১৮৩৩ সালে ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দাস প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৫৫-১৯৫৮ সালে আফ্রিকান আমেরিকান আন্দোলনের মাধ্যমে আমেরিকাতে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি, অর্থনৈতিক মন্দা, ফ্যাসিবাদ ও নাত্সীবাদ নারীদের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে জার্মানী, ইটালি, অস্ট্রিয়া ও জাপানের মত দেশগুলোর সম্পর্ক হয়ে ওঠে গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিকের মাঝে দ্বন্দের। স্পেন, পর্তুগাল, আর্জেনটিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, চিলিসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০-১৯৯০ এর মধ্যে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ও জার্মানির পুণঃএকত্রীকরণ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

<u>গণতন্ত্রের প্রকারভেদ:</u>

গণতন্ত্রকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। একটি সাধারণ বিভাজন হলোঃ প্রত্যক্ষ ও প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।

১)প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র:

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এই ব্যবস্থায়, জনগণ নিয়মিতভাবে জনসভা, ভোটগ্রহণ, ইত্যাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উদাহরণ হল প্রাচীন গ্রিসের অ্যাথেন্স।

২) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র:

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এই ব্যবস্থায়, জনগণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন, সরকার গঠন, ইত্যাদি কাজ করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের উদাহরণ হল আজকের বেশিরভাগ রাষ্ট্র। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র আবার দুই ব্যবস্থায় ভাগ করা যায়। যথাঃ ১. সংসদীয় ব্যবস্থা ও ২. রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা।

স্তম্ভ:

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মূলত তিনটি স্তম্ভ বা ভিত্তির উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়। এই মূল ভিত্তিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়, ক্ষমতার সুষম বন্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে শাসনকার্যকে পরিচালনা করতে সার্বিক সহায়তা করে।

১. আইন বিভাগ:জনগনের জন্য সংবিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন করাই এই বিভাগের প্রধান কাজ। নাগরিকদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধিগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে আইন প্রণয়নের কাজের দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত হন, আইন্সভায় স্থানপ্রাপ্ত হন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংবিধানের মূল কাঠামোর উপর নির্ভর করেই আইন প্রণয়ন করে থাকেন।

২. শাসন বিভাগ:প্রচলিত আইন মোতাবেক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্ন রাখাই এই বিভাগের প্রধান কর্তব্য। নাগরিকদের ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ মূলত শাসন বিভাগের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের প্রধান হিসেবে কর্মরত থাকেন। রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলিত আইন অনুসারে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে এই বিভাগ। এই বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাগণ সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

৩. বিচার বিভাগ:বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে মূলত এই বিভাগ গঠিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত এবং কেন্দ্রীয় শীর্ষ আদালত নিয়ে গঠিত হয় বিচার বিভাগ। এই বিভাগের প্রধান কাজ হল রাষ্ট্রের আইন মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ের বিচার কার্য সম্পন্ন করা। আইনসভার প্রস্তাবনা বা সিদ্ধান্ত সংবিধান সম্মত কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহনের এখতিয়ার আছে এই বিভাগের।
এই তিনটি মূল বিভাগের কার্যক্রম স্বচ্ছ এবং ক্ষমতার সুষম বন্টন থাকলে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করা এবং ভালোভাবে জনকল্যাণমূলক উপায়ে একটি রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে থাকে।

৪.গণমাধ্যম: একটি দেশের সার্বিক ও সকল পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করে সে বিষয়ে জনগণকে অবহিত করতে পারে বলে সংবাদ মাধ্যমকে একটি রাষ্ট্রের আয়না বলা হয় এবং বর্তমানে একে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়।
কেননা একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা, শাসনকার্যের দায়িত্বে থাকা জনপ্রতিনিধিগণ, তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার ক্ষমতা রয়েছে সংবাদমাধ্যমের। এজন্য রাষ্ট্রের সুশাসন এবং সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য অন্য তিনটি মূল বিভাগের পাশাপাশি, সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অতি জরুরি।

গণতন্ত্রের মূলনীতি বা গণতন্ত্রের ভিত্তি:

গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ হল এমন কিছু নীতি ও আদর্শ যা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে। গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ ছাড়া, একটি রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না।
গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ
১)নাগরিক অংশগ্রহণ:গণতন্ত্র নাগরিকদের সরাসরি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার এবং ভবিষ্যত গঠনের ক্ষমতা প্রদান করে। নাগরিকদের অংশগ্রহণই হলো গণতন্ত্রের ভিত্তি, যার মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের আলোচনা, বিতর্ক, সভা- সমাবেশের

মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। নাগরিক সংগঠন এবং সুশীল সমাজ এই ধরণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় সরকার ও সমাজের বৃহত্তর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে।

২)সমতা:জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে বৈষম্য ছাড়াই সমস্ত মানুষের সাথে সমান আচরণ করা গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভোটাধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের সমান অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকের পছন্দ, প্রতিটি ভোটকে সমানভাবে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে সাম্যকে একটি মৌলিক নীতি হিসেবে গণতান্ত্রিক সমাজে কার্যকর করে তোলে।

৩)স্বচ্ছতা:স্বচ্ছতা বলতে বোঝায়, সরকারের কার্যাবলির কার্যকারিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং নিয়ম-অনুসরণ সহ সরকারের কর্মক্ষমতা নাগরিকদের কাছে উন্মুক্ত ও স্পষ্ট থাকবে। রাজনীতিবিদ, কিংবা সরকারকে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকবে। নাগরিক, সাংবাদিক কিংবা অন্যান্য পর্যবেক্ষনকারী সংগঠনগুলোর অনুরোধের ভিত্তিতে অবাধ তথ্য সরবরাহের সুযোগ থাকতে হবে।

৪)জবাবদিহিতা:জনগণ নির্বাচিত কর্মকর্তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, আর তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজকে সঠিকভাবে তাদের প্রতিদান দেয়া। জবাবদিহিতার আওতায় থেকে রাজনীতিবিদদের অবশ্যই দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করা যাবে না। কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলি মিডিয়া এবং সুশীল সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা কঠিন করে তোলে।

৫)রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা:গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা অপরিহার্য। এক পক্ষের সাথে আরেক পক্ষের, এক দলের সাথে আরেক দলের, এক সমাজের সাথে আরেক সমাজের মতামত ভিন্ন হবেই। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্য। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সাথে ভিন্ন মতের অবাধ চর্চাই হলো গণতন্ত্র। এই ভিন্ন ভিন্ন মত বা রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা যদি না থাকে তাহলে গণতন্ত্র ভেঙে পড়বে। গণতান্ত্রিক চর্চায় সংখ্যাগরিষ্ঠই নেতৃত্ব দেয়। তবে, সংখ্যালঘুদের মতামতকে, অধিকারকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। সত্যিকার অর্থে, ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়, বরং প্রত্যেক নাগরিকের সমান ও সম্মানজনক ভাবে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। উন্মুক্ত এবং সমৃদ্ধ চিন্তার ভিত্তিতেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়,

এবং সংখ্যালঘুদের মতামত প্রকাশের অধিকার দমন করার ফলে গণতন্ত্রের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৬)বহু দলীয় ব্যবস্থা:গণতন্ত্রে নাগরিকদের পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ থাকবে। সবার জন্য স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার সমান অধিকার থাকবে। প্রত্যেকেই তাদের আদর্শ, পছন্দ অনুযায়ী সংগঠিত হতে পারবেন, দলের সমর্থণ করতে পারবেন। তাদেরকে কোন একটি নির্দিষ্ট দল বা মতের অনুসারী হতে বাধ্য করা যাবেনা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। অর্থাৎ, কোন একক দল নয় বরং, নির্বাচনের সময় একাধিক দলের মধ্যে নির্বাচন করার স্বাধীনতা থাকবে। নাগরিকরাই ঠিক করবেন নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্র পরিচালন প্রক্রিয়া কি হবে।

৭)ক্ষমতার অপব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ:যখন শাসন কার্যক্রমে নাগরিকদের সমর্থন থাকে এবং রাজনীতিবিদরা নিয়ম কানুন মেনে চলেন তখনই গণতন্ত্র বিকশিত হয়। যখন সরকারগুলি আইনের ঊর্ধ্বে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, রাজনীতিবিদরা বিশ্বাস করেন যে তাদের জন্য ভিন্ন আইন প্রযোজ্য, কিংবা রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর পক্ষ নেয়, অথবা জনগণের অর্থ দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের পকেটে চলে যায় তখনই ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, শাসন কার্যক্রম ও ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিকরণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী আইন ও নির্বাচন নিশ্চিত এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সরকারের ক্ষমতা অসীম নয় এবং জনগণই ক্ষমতার উৎস।

৮)অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:গণতন্ত্রে, একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব জীবন যাপনে সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন হবেন। যতক্ষণ না ব্যক্তি নিয়মের অবাধ্য হন, ততক্ষণ তাদের কী শিখতে হবে বা তাদের কী পেশা নিতে হবে বা তাদের কী করতে হবে তা বলার বা ঠিক করে দেয়ার দায়িত্ব সরকারের নয়। ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা সরকারের দায়িত্ব। কেননা, শক্তিশালী সমাজ এবং শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ।

৯)মৌলিক অধিকার:মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি। মৌলিক অধিকার হল এমন কিছু অধিকার যা সকল মানুষের জন্য অলঙ্ঘ্যনীয়। এই

অধিকারসমূহ মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য। যেমনঃ জীবন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, ন্যায়বিচার ও আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার, মান সুযোগ ও সুবিধার অধিকার, স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার অধিকার ইত্যাদি।
গণতন্ত্রে জনগণই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাই সরকারের কার্যক্রমে জনগণের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কিন্তু, সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্য মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।
১০)মানবাধিকার:মানবাধিকার হলো সমস্ত মানবকে জন্মগতভাবে সমান এবং মর্যাদাপূর্ণ অধিকার যা তাঁদের স্বাধীনতা, ন্যায্যতা এবং সমতা নিশ্চিত করে। এই অধিকারগুলি মানুষের জন্মগত অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়। মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন ও নীতি মানবজাতির সমস্ত সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন ও নীতি মানবজাতির সমস্ত সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন ও নীতি মানবজাতির সমস্ত সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। বিভিন্ন ধরণের মানবাধিকার রয়েছে, যেমনঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার,ইত্যাদি। মানবাধিকার গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ও সাফল্যের জন্য অপরিহার্য।
১১)অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন:যেভাবে সময়ে সময়ে জনমত পরিবর্তিত হয়, তেমনি কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য ক্ষমতার স্বাভাবিক ও নিয়মিত পরিবর্তন আবশ্যক। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল হতে হবে। একটি সুস্থ গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে সরকারের ইচ্ছামাফিক বা অনিয়মিত নির্বাচন আয়োজন করা যাবেনা। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কার্যকরি, ও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা তৈরী ও সংরক্ষণ করতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পাশাপাশি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে ক্ষমতাসীনদের অবশ্যই পরাজয় মেনে নিতে হবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে পদত্যাগ করতে হবে। ক্ষমতার শান্তিপূর্ন পালাবদলই গণতন্ত্রের স্বরুপ দাড় করায়। নির্বাচনে পরাজিতদের পরাজয় মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরী ও চর্চা করতে হবে।
১২)স্বাধীন বিচার বিভাগ:গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ অত্যাবশ্যক। বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন কি না তা দেখলেই বোঝা যায় একটি দেশ গণতান্ত্রিক কিনা। স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকলেই কেবল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। শাসক কিংবা শাসিত, গরীব

কিংবা ধণী, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা বিচার বিভাগের দায়িত্ব। এবং বিচারের বিভাগ যদি স্বাধীন হয় কেবল তখনই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সরকার যদি কোন বিচারিক সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বা আদালতকে তার সুবিধার্থে ব্যবহার করে তবে সেই গণতন্ত্র টেকসই নয়, অতি শীঘ্রই সেই গণতন্ত্র ভেঙে পড়বে।

১৩)আইনের শাসন:আইনের শাসন হল এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সকল নাগরিক, এমনকি সরকারের সদস্যরাও আইনের অধীন। গণতন্ত্রে, আইনের শাসনের অর্থ হলো, একটি দেশের আইন সব মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, এবং প্রত্যেককে, বিশেষত সরকারকে অবশ্যই আইন মেনে চলতে হবে। আইনের শাসন গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য নীতি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হলে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সার্বভৌমত্ব, আইনের সমতা, আইনের প্রাধান্য, আইনের কর্তৃত্ব, আইনের কছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দর্শন:

গনতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল গণতান্ত্রিক থিউরি অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আর এর ভিত্তি ছিল গণতন্ত্রের জনক হিসেবে পরিচিত রুশোর দর্শন। রুশো অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করে এবং ফরাসি বিপ্লবের কিছু বছর পূর্বে ফ্রান্সে মারা যায়। তার বই (Social Contact) 'সামাজিক সম্পর্ক' এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এই বইয়ে রুশো আধুনিক গণতন্ত্রের পূর্ণ নকশা পেশ করে। বইয়ের শুরু হয় এই বাক্য দিয়ে, 'মানুষ স্বাধীনভাবে জন্ম নিয়েছে; কিন্তু তাকে সমস্ত ক্ষেত্রে শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।' রুশো মানুষকে একটি পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচার ব্যক্তিত্ব হিসেবে পেশ করে। সে বলে যে, 'মানুষের চাহিদা হলো স্বাধীনতা, নিজ চাহিদামতো চলা ও সমতার সাথে থাকা এবং জীবনে সুখের জন্য উন্নতি করা। এই সবই প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদা।' এটাকে রুশো নাম দিয়েছে (general will) 'সাধারণ ইচ্ছা'। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা' ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকে, যাকে রুশো নাম দিয়েছে (Will of all) 'সকলের ইচ্ছা'। সকলের ইচ্ছা এবং সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য রুশো একটি পূর্ণ নকশা পেশ করে, যাকে আজ 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা' বলা হয়। রুশোর মতে মানুষের এমন সংবিধান প্রয়োজন, যা সবার জন্য নিরাপত্তা, সুখ, সমতা, উন্নতি ও

স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করবে। এই মূলনীতিগুলো অনুযায়ী সামাজিক জীবনযাপন করাই সমস্ত মানুষের ইচ্ছা, যাকে রুশো নাম দিয়েছে 'সাধারণ ইচ্ছা বা মূল ইচ্ছা' (Real Will)। অতঃপর এই মূল ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের জন্য সবাই নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে 'সাধারণ ইচ্ছা'র অনুগামী করে নেবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে রুশো নাম দিয়েছে 'সবার ইচ্ছা' (will of all)। অর্থাৎ সকলের ইচ্ছাকে সাধারণ ইচ্ছার অনুগত করা আবশ্যক। সাধারণ ইচ্ছাকে মূল ইচ্ছোর অনুগত করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি বাছাই করবে। এই নির্বাচন দ্বারা 'সাধারণ ইচ্ছা' জনগণ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে চলে যাবে। তখন এই প্রতিনিধিরা একটি কমিটি বৈঠক প্রতিষ্ঠা করবে, যার নাম হবে পার্লামেন্ট। অতঃপর পার্লামেন্ট এমন আইন তৈরি করবে, যা সকলের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ (সকলের ইচ্ছা প্রণীত আইন দ্বারা বাস্তবায়িত হবে এবং সাধারণের ইচ্ছা পার্লামেন্টের দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর পার্লামেন্ট যখন তাদের প্রণীত আইনে স্বাক্ষর করবে, তখন এর দ্বারা মূলত সাধারণ জনগণের ইচ্ছা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে 'মূল ইচ্ছা বা সাধারণ ইচ্ছা'র অনুগত করে দেওয়া হয়।

নির্বাচন পদ্ধতি:

প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্ধারণের জন্য নির্বাচন অপরিহার্য, আর নির্বাচনের জন্য প্রতিযোগিতাশীল রাজনৈতিক দলসমূহের অস্তিত্ব আবশ্যক। প্রচলিত গণতন্ত্রের একটি প্রধানত দিক হলো যেকোন দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনগণের ভোটে বিজয় হয়ে সরকার গঠন করার প্রত্যাশা জনগণের সম্মুখেই ব্যক্ত করে। এছাড়াও দল জনগণের ভোটে বিজয় হয়ে সরকার গঠন করার সুযোগ পেলে দেশ ও জাতির কল্যাণে কি কি কাজ করবে তা দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্ট উল্লেখ করার মাধ্যমে ইশতেহারের পক্ষে জনগণের রায় (ভোট) আদায় করার চেষ্টা করে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সংসদে আইন প্রণয়ন সবকিছুই সর্বজনীন। রাষ্ট্রের নাগরিককে ধর্মীয় দিক থেকে বিবেচনা নয় নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে তার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব। প্রচলিত গণতন্ত্রের একটি প্রধানত দিক হলো যেকোন দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনগণের ভোটে বিজয় হয়ে সরকার গঠন করার প্রত্যাশা জনগণের সম্মুখেই

ব্যক্ত করে। এছাড়াও দল জনগণের ভোটে বিজয় হয়ে সরকার গঠন করার সুযোগ পেলে দেশ ও জাতির কল্যাণে কি কি কাজ করবে তা দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্ট উল্লেখ করার মাধ্যমে ইশতেহারের পক্ষে জনগণের রায় (ভোট) আদায় করার চেষ্টা করে থাকেযেকোনো নির্বাচন সঙ্গত কারণেই গুরুত্ব বহন করে। যেমন- সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, নীতি-নৈতিকতা, বিচার সালিশ, ন্যায্য অধিকার, সুস্থরাজনীতি, মানবিক মর্যাদা, সুশাসন, সাম্য, ধর্ম-বর্ণে সম্প্রীতি ও জনগণের প্রত্যাশিত জনপ্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্র ও ভোট বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা যে প্রচলিত গণতন্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচন ও ভোট দেখছি বা অংশগ্রহণ করছি তা হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে সরকার নির্বাচনের কিংবা বিভিন্নপর্যায়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার পদ্ধতিজনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করতে নির্বাচন অপরিহার্য প্রক্রিয়া। তাছাড়াও রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে বাছাই করার সুযোগ পায় এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল ও প্রার্থীদের জন্য ভোট হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়ার মোক্ষম পন্থা। এলাকার উন্নয়ন কাজ-কর্ম যার দ্বারা অধিকতর হবে বলে মনে করে মানুষ সাধারণত তাকেই ভোট দিয়ে থাকে। এমনকি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজ ইত্যাদি বিষয়ও মুখ্য হয়ে উঠে।

নির্বাচনের প্রকারভেদ:নির্বাচন দুই প্রকার।যেমন- প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন : যে নির্বাচনে জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি বাছাই করে তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলা হয়। যেমন- বাংলাদেশের সংসদ সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

পরোক্ষ নির্বাচন : জনগণ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচিত করেন। এই জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন। যেমন- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মধ্যবর্তী সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন।

গনতন্ত্রের ত্রুটি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম তাঁর 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা' গ্রন্থে প্রচলিত গণতন্ত্রের নয়টি ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। এখানে তাঁর বর্ণনালোকে ত্রুটিগুলো বিশেষণ করা হলো।

১. মূলনীতিই ত্রুটিপূর্ণ: প্রচলিত গণতন্ত্রে নীতিগতভাবে গণ ইচ্ছার প্রভূত্ব সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছে যা এ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। কেননা প্রথমতঃ সামগ্রিক ইচ্ছার কোনো অস্তিত্বই বর্তমান নেই; এটা একটি অসম্ভব কল্পনা মাত্র। বাস্তব অবস্থা হলো গণতন্ত্রে গণইচ্ছার নামে দলীয় ইচ্ছা এবং দলীয় ইচ্ছার নামে দলের প্রধানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চলে থাকে। অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন, "কোনো জ্ঞান বা বুদ্ধি জনমতের উৎস নয় বরং দলীয় স্বার্থ হতেই তা উৎসারিত হয়ে থাকে। এজন্য নির্বাচনে এমন সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে, যার কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পেশ করা যায় না।

২. রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা: গণ ইচ্ছার স্থায়ী কোনো শক্তি নেই। এটা অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষণস্থায়ী এবং নিত্য পরিবর্তনশীল। যে কোনো প্রবল শক্তির সামনে এ ইচ্ছা দমিত হতে বাধ্য। একে প্রলোভিত, বিভ্রান্ত এবং সামান্য ব্যাপারেও ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত ইচ্ছা বা স্বার্থের জন্য যে কোনো সময় উত্তেজিত করা সহজ। এভাবে অন্তঃসারশূন্য শক্তির ওপর যে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হবে তা কোনোদিনই শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে বা টিকে থাকতে পারবে না। কেননা যে ইচ্ছা নিজে শক্তিহীন তা অন্যকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা রাখে না।

৩. জাতীয়ভাবে নৈতিক অবক্ষয়: দেশের সাহিতা, নৈতিকচরিত্র ও মনস্তাত্বিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় গণ ইচ্ছার প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের কোনো স্থায়ী নৈতিক মানদণ্ড এবং এর আইনের জন্য কোনো দৃড় নৈতিক ভিত্তি বর্তমান থাকা সম্ভব হয় না। তখন জনগণের মধ্যে কোনো খারাপ ঝোঁক, লালসা-প্রবণতা জেগে উঠলে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আইন তা কেবল প্রতিরোধ করতেই ব্যর্থ হয় না, বরং তার দায়িত্ব ও উন্নতি ক্ষুন্ন হওয়ার পক্ষে তা প্রধান কারণ হয়ে পড়ে। কেননা এখানে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন গণইচ্ছা ও জনগণের ঝোঁক প্রবণতার অধীন হয়ে পড়ে। এর পরিণাম অত্যন্ত

সুস্পষ্ট। জনগণ এক কদম ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হলে রাষ্ট্র তাদেরকে আরো একশ কদম ধ্বংস গহ্বরে ঠেলে দেয়। ফলে মানবতার ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। নৈতিক চরিত্রহীনতা, পাপ, অশ্লীলতা গণতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নতির সাথে সাথে ব্যাপক আকার ধারণ করে। অতীতের ইতিহাস ও বর্তমানের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হতে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড এবং পশ্চিমা বিশ্বের দেশসমূহ এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এ কারণেই ধর্মহীন গণতান্ত্রিক দেশে জনৈতিক চরিত্রের এমন কোনো স্থায়ী নাম বর্তমান থাকতে পারে না যাকে ভিত্তি করে জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলা সম্ভব।

৪. অনৈক্য ও দলাদলি: দলীয় হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, দলত্যাগ, মুহূর্তের মধ্যে নতুন দল গঠন ও দলগত কোন্দল গণতান্ত্রিক সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ফলে সত্য-ভাষণ ও সত্যপ্রীতির গুণ মানব সমাজ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে জাতির নৈতিক ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরপর এটাই দলীয় স্বৈরাচার ও সংখ্যাধিক্যের যুলুমে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এটা যে গণতন্ত্রের এনিকৃষ্টতম নিদর্শন এবং এর কারণেই যে পশ্চিমা বিশ্বে অসংখ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভেঙে গেছে তা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য।

৫. বাক-স্বাধীনতা লোপ :গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীন দলের হাতেই নিবদ্ধ থাকে। তাতেও দলীয় শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে গণ-প্রতিনিধিদের সত্যভাষণ ও সত্য সমর্থনের অধিকার নির্মমভাবে হরণ করা হয়। এর ফলে প্রথমত, গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, যা গণতন্ত্রকে একটি অন্তঃসারশূন্য শ্লোগানে পরিণত করে মাত্র। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা যেহেতু মানুষ- ফেরেশতা নয়, তাই তাদের রচিত আইন-কানুনে তাদের ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতার তীব্র প্রভাব অনিবার্যরূপে পরিলক্ষিত হয়। তখন ক্ষমতাসীন দলের মর্জিই হয় দেশের আইন, আর তার স্বার্থ রক্ষাই হয় সুবিচারের একমাত্র মানদণ্ড। যে কারণে দলপরিবর্তনের সাথে সাথে মানদণ্ডও পরিবর্তিত হয়। এমন অবস্থায় এক একটি দেশে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য জরুরি অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। তখন নাগরিক বা রাষ্ট্র কারো ভাগ্যেই একবিন্দু শান্তি ও স্বস্তিঃ লাভ করা সম্ভব হয় না।

৬. ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদের চিরন্তন দ্বন্দ্ব:প্রচলিত গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার ভাব বর্তমান থাকে। প্রথম দল দ্বিতীয়

দলটিকে অবদমিত ও পর্যুদস্ত করতে সবসময় চেষ্টা করে। সরকারি দলের আনা যে কোনো বিলের নির্বিচার বিরোধিতা করাই হয় তখন বিরোধী দলের ধর্ম।

পক্ষান্তরে, বিরোধী দলের যে কোনো সংশোধনীকে ভোটাধিকোর বলে বাতিল করে দেয়াই হয় সরকারি দলের বিজয় উল্লাস। সত্যের আদর্শ না সরকারি দলের হাতে উজ্জ্বল হতে পারে না বিরোধী দলের আচরণে। বরং উভয় পক্ষ মিলেই সত্যের নীতি ও আদর্শকে বিপর্যস্ত করে রাখে।

৭. সুবিধাবাদের জনক: পাশ্চাত্য ধারণা অনুসারে গণ-ইচ্ছা যেহেতু পরিবর্তনশীল সে কারণে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কোনো স্থায়ী ও সুদৃঢ় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বরং তাতে সুবিধাবাদ, বহুরূপীভাব ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা এত বেশি দেখা যায় যে, এর প্রতি বন্ধু রাষ্ট্র বা শত্রু রাষ্ট্র কারোই কোনো আস্থা স্থাপিত হয় না। কোনো স্থায়ী নীতি ও আদর্শ অনুসৃত হয় না বলে আজকের সিদ্ধান্ত আগামীকাল পরিবর্তিত হবে কি না সে ব্যাপারে কোনোভাবেই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

৮. পুঁজিবাদের পৃষ্ঠপোষক: প্রচলিত গণতন্ত্রে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা অনিবার্য। আর একই রাষ্ট্রে যখন প্রচলিত গণতন্ত্র আর পুঁজিবাদ মিলিত হয় তখন ক্ষমতা শুধু পুঁজিপতিদের হাতে জমা হয়। তাদের ইচ্ছায় রাষ্ট্রের শাসন রীতি, আইন-কানুন ও ক্ষমতা পরিচালিত ও প্রণীত হয়। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষ পুঁজিপতিদের হাতে চিরদিনের জন্য বন্দি হয়ে পড়ে। তারা এর কবল থেকে মুক্তি পায় না। এমনকি এর কুপ্রভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মীর স্থলে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক পর্যন্ত হয়ে যায়। ফলে প্রচলিত গণতন্ত্রে কোনো নীতি বা আদর্শের নয় বরং পুঁজিপতিদের প্রতাপ, প্রভাব ও দাপট স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। তাই এ ধরনের শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা বলা যায়।

৯. অর্থনীতিভিত্তিক শাসননীতি:প্রচলিত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণ কাজ কেবল অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন হতে বাধ্য। কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই এ অনিবার্য পরিণতি হতে রক্ষা পেতে পারে না।কেননা গণইচ্ছা যা গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল- ব্যক্তিগত ইচ্ছারই সমষ্টিগতরূপ এবং ব্যক্তি ইচ্ছা যখন স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে পড়ে তখন লালসা, বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া জনগণের আর কোনো লক্ষ্য থাকে না। আর এ প্রবণতাকেই প্রচলিত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক শাসন পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে অর্থনীতি ছাড়া জীবনের অন্যান্য নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাবলি তার দৃষ্টিতে শুধু গৌণই হয় না, একেবারে গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

খিলাফত ও গণতন্ত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

উপরে খিলাফত ও গনতন্ত্রের স্বতন্ত্র বিস্তারিত আলোচনা কর হয়েছে। এই দুই ব্যবস্থার নীতি,আদর্শ, পদ্ধতি ও মূল্যবোধ বিবেচনা করলে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই দুই রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেন মুদ্রার এপিট-ওপিট। এই পর্যায়ে এদুয়ের মধ্যে তৌলনিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হলো:

১. উৎস : গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিভিন্ন মানুষের চিন্তা- চেতনা থেকে উৎসারিত। পক্ষান্তরে খিলাফত ব্যবস্থা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে উদ্ভূত এবং প্রতির্ষ্ঠিত। কেননা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গজীবন বিধান। এর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা ও দর্শন এর পূর্ণতাই প্রমাণ করে।

আল্লাহ তা'আলা এ পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন,

اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

ورضيت لكم الإسلام دينا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমাত দান পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা:৩)

২. প্রকৃতি: গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চরম ব্যবস্থা। এর সকল কিছুই সাধ্যের সর্বোচ্চসীমা পর্যন্ত প্রসারিত। এ ব্যবস্থা মানুষকে সকল ব্যাপারে চরমপন্থি করে। তোলে। প্রতিযোগিতা, ভোগ, উপার্জন ইত্যাদি কাজে এ নীতির ছাপ পড়ে। ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রটি চরমপন্থি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা মধ্যপন্থি এবং নিয়ন্ত্রিত নীতিমালার প্রবর্তক। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে মধ্যমপন্থি জাতি হিসেবেই বিশ্বজাহানে প্রেরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

"তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে নিষেধ কর।" (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

৩. নীতি নির্ধারণ: গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নীতি-নির্ধারণে মানুষের ভূমিকাই মুখ্য। ফলে যে কোনো নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব। তাদের বিবেচনায় যা কল্যাণকর তেমন সিদ্ধান্ত নেয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক মূলনীতি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত। মানুষ কেবল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সে নীতির আলোকে নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু নতুন কোনো আইন প্রদান করতে পারেনা। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يقولون هل لنا من الأمر من شيءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُله لله

"তারা বলে, 'হুকুম দানে আমাদের কোনো অধিকার আছে কি?' হে রাসূল ﷺ! আপনি বলুন, হুকুম দেয়ার সার্বভৌম ও সামগ্রিক ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৪)

৪. মালিকানা: গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সম্পদের একচ্ছত্র এবং একমাত্র মালিক মানুষ। ফলে সে যেভাবে ইচ্ছা তার সম্পদ ব্যয় ও ভোগ করতে পারে। খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ। মানুষ এর তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। ফলে চাইলেই সে যা খুশি তা ব্যয় ও ভোগ করতে পারে না। তাকেনআল্লাহর মালিকানার দাবি মেনে তাঁর হুকুম অনুসারে অর্থ সম্পদ ব্যয় ও ভোগ করতে হয়। আল্লাহ বলেন,

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن نشاء

"হে রাসূল (স)। আপনি বলুন, হে আল্লাহ। আপনি সার্বভৌম ক্ষমতা ও সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। যাকে ইচ্ছা আপনি মালিকানা দান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছো মালিকানা ছিনিয়ে নেন।" (সূরা আলে ইমরান:২৬)

৫. ব্যক্তি মালিকানা: গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবাধ ব্যক্তিমালিকানা আছে। এখানে ব্যক্তিই সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক। তার মালিকানা নিয়ন্ত্রণহীন এবং অসীম।খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা আছে তবে তা অবাধ নয়। বরং ইসলামের নীতি ও আদর্শ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। ফলে বাক্তি সতর্ক থাকে। ব্যক্তি মালিকানায় সীমিত ভোগ ও নিয়ন্ত্রিত অধিকারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

"তোমরা খাও, পান কর, অপচয় কর না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালোবাসেন না।" (সূরা আরাফ ৩১)

৬.কাঠামোগত পার্থক্য: গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র একটি ধর্মহীন সেকুলার রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থায় ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন ও অনুশাসনের সুযোগ থাকলেও সামষ্টিকভাবে তাতে নিরুৎসাহই সৃষ্টি করা হয়। ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মহীনতার প্রবল ধারা প্রতিষ্ঠা করা হয়।পক্ষান্তরে, খিলাফত হলো একটি ধর্মভিত্তিক আদর্শ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

৭. সংবিধান প্রণয়ন: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণীত হয় আইনসভা কর্তৃক। আইনসভা নির্বাচন করে সাধারণ মানুষ। সে কারণে এ রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রকৃত প্রণয়নকারী হিসেবে সাধারণ মানুষের কথা ঘোষণা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে আইনসভার সদস্যদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাতেই গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণীত হয়। পক্ষান্তরে,খিলাফত ব্যবস্থায় সংবিধান প্রণেতা হলেন মহান আল্লাহ। বলা যায় খিলাফতের মূল সংবিধান হলো কুরআন ও সুন্নাহ। আইনসভা এ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন করতে পারে না। তারা কেবল কুরআন-সুন্নাহে বিবৃত আইনসমূহ ব্যাখ্যা করে ও তার প্রয়োগক্ষেত্র ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়।

৮. নির্বাচন পদ্ধতি:গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার প্রধান হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করে। নির্বাচন করে, নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রচারণা চালায়

এমনকি অর্থ ও বিত্ত ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে,খিলাফতে জনগণ যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকেই খলীফা নির্বাচন করেন। কেউ প্রার্থী হয় না।

৯. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন সভাই আইন প্রণয়ন করে। অনেক সময় ক্ষমতাসীন দল তাদের ইচ্ছামতো আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তন করে থাকে। পক্ষান্তরে,খিলাফতে আইন প্রণীত হয় কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে।

১০. বিচারব্যবস্থা: গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয় মানব রচিত আইন বা বিধিবিধান দ্বারা। পক্ষান্তরে, খিকাফতে আল্লাহ প্রদত্ত শরীআত অনুযায়ী দেওয়ানী ও ফৌজদারীসহ সবরকম বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতা নেই বিচারের নীতি ও পদ্ধতি চালু করা। এ ব্যবস্থায় যে কোনো মূল্যে ন্যায়বিচার কায়িমের কথা বলা হয়। ধনী, নির্ধন, সাদা, কালো, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে বিচারের ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা দেয়ার বাধ্যবাধকতা ইসলামী ব্যবস্থাতেই রয়েছে। এখানে শাসক বা শাসিত কোনো পক্ষই বিচারে বিশেষ সুবিধা পায় না। নিজের বিপক্ষে গেলেও ইসলাম সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفُسِكُمْ أو الوالدين والأقربين إن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بهما فلا تَتَّبِعُوا الهوى أن تَعْدِلُوا وإن تَلوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"মুমিনগণ! আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে তোমরা ন্যায়বিচারে অটল থেকো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা মাতা-পিতার কিংবা তোমাদের স্বজনদেরও বিরুদ্ধে যায়। সে যদি ধনী হয় বা গরীব হয় তাহলে তাদের উভয়ের জন্যে আল্লাহ তা'আলাই উত্তম অভিভাবক। কাজেই ন্যায়বিচার করতে যেয়ে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। আর তোমরা যদি ঘুরিয়ে কথা বল বা সত্য গোপন কর, তাহলে মনে রেখ। তোমরা যা করছো তার সব খবরই আল্লাহ তা'আলা জানেন।" (সূরা নিসা : ১৩৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنَّ الله يُحِبّ الْمُقسطين

অর্থ: "আর যখন তুমি বিচার কর, লোকদের মধ্যে ন্যায়নীতির সাথে বিচার করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণদের খুবই ভালোবাসেন।” (সূরা মায়িদা: ৪২)

১১. প্রশাসনিক নীতি-পদ্ধতি: গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসনব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক।

পক্ষান্তরে, খিলাফতে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা জনগণের সেবায় নিয়োজিত করা হয়। মানব কল্যাণ তথা জনসেবাই এর মূল লক্ষ্য। এখানে দেশ ও দশের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ কখনোই অগ্রাধিকার পায় না।

১২. **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা:** গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিই পুঁজির নিরঙ্কুশ মালিক। অর্থ উপার্জন ও ব্যয় বন্টনে তার কোনো বিধিনিষেধ থাকে না। সে যে কোনোভাবে সম্পদ উপার্জন ও ভোগ করতে পারে। পক্ষান্তরে,খিলাফতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় একটি সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানের অধীনে। এ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আনার জন্য যাকাত, উশর, খারাজ জিযিয়া প্রভৃতি বিধান চালু করা হয়।

১৩. **রাষ্ট্রীয় কোষাগার:** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোষাগার ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নামে পরিচিত। অন্যদিকে খিলাফতে মূল কোষাগার হলো বায়তুলমাল।

১৪. **মৌলিক বিশ্বাস:** গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনো মৌলিক আদর্শে বিশ্বাসী নয়। অন্যদিকে খিলাফত মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার দেয়া জীবন বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করে। ইসলামের বুনিয়াদী আকীদার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে না।

১৫. **সার্বভৌমত্ব:** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মনে করা হয়

"Sovereignty is the will of the state" সাধারণ বিবেচনায় রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি কিংবা রাষ্ট্রের জনগণ অথবা রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়। কোথাও কোথাও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করা হয় আইন পরিষদ বা সংসদকে। সার্বভৌম ক্ষমতা হলো সর্বময় ক্ষমতা। আইন প্রণয়ন, শাসন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা। পক্ষান্তরে,খিলাফতে ক্ষমতার একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ অধিকার আল্লাহ তা'আলার। কুরআনে এসেছে,

قل اللهم مالك المُلْكِ تُؤْتِي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كل شيءٍ قدير

“হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি বলুন, 'হে আল্লাহ! আপনি রাজত্ব, কর্তৃত্ব, মালিকানা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা মুলক দান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা মুলক ছিনিয়ে নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত

করেন। সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চয় আপনি সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" (আলে ইমরান: ২৬)

আরো বলা হয়েছে,

يقولون هل لنا من الأمر من شيءٍ قُلْ إِنَّ الأمر كله لله

"তারা জিজ্ঞাসা করে হুকুম দানে আমাদের কোনো অধিকার আছে কি? বলুন (মুহাম্মদ স), হুকুমদানের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।" (আলে ইমরান: ১৫৪)

১৬. রাষ্ট্রপ্রধান: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যে কোনো জাতি,ধর্ম বা বর্ণের হতে পারে। কিন্তু খিলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রপ্রধানসহ ইসলামী রাষ্ট্রের সব সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক শীর্ষপদে মুসলিম ব্যক্তি নিয়োজিত হবেন। নিষ্ঠাবান মুসলিম ছাড়া কোনো অমুসলিম এ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। কেননা আল্লাহর খলীফা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ কেবল মুসলিমগণ। আল্লাহর আইন ও শাসন পদ্ধতির মূল আমানতদার তারা। তা ছাড়া মুসলিমদের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য ফরয। রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম না হলে এ ফরযিয়াত মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহর বিধান অনুসারে) আদেশ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন তাদের আনুগত্য কর। এরপর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট অর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি, রাসুল ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে থাক। এটাই উত্তম এবং এর পরিণামই সুন্দরতম।" (সূরা নিসা: ৫৯)

১৭. পুরুষ রাষ্ট্রপ্রধান: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান নারী বা পুরুষ যে কেউ হতে পারে। কিন্তু খিলাফতে খলীফাকেকে অবশ্যই পুরুষ হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন,

الرَّجالُ قوامون على النساء

'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করবে।' (সূরা নিসা: ৩৪)

রাসূলুল্লাহﷺবলেছেন, "সে জাতি কখনোই সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করবে না, যে জাতি তাদের নেতৃত্ব অর্পণ করবে নারীকে।” (সহীহ বুখারী)। তবে যে রাষ্ট্র ইসলামী হুকুম-আহকাম অনুসারে পরিচালিত হয় না এমন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে নারী নেতৃত্ব চললে তা এ হুকুমের আওতাভুক্ত হবে না। কেননা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেই ইসলামী রাষ্ট্র হবে না। সে জন্য নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতিগতভাবে রাষ্ট্রটি ইসলামী হতে হবে। সে কারণে যে দেশ ইসলামী নয় সে দেশের জন্য ইসলামী নিয়ম-কানুন বাধ্যতামূলক কর। বা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর সাধারণভাবে নারীর শারীরিক ক্ষমতা এবং নারীসুলভ নিয়মমাফিক অসুস্থতাও তার এ দায়িত্ব পালনের জন্য অনুকূল নয়। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মসজিদ ও ঈদগাহের ইমামও বটে। রাসূলুল্লাহﷺও খুলাফা ই রাশীদিন নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। নারীর পক্ষে প্রকৃতিগত অসুবিধার জন্যই এ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

১৮. জবাবদিহির ক্ষেত্রে: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে জনগণ বা মন্ত্রীদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। সে জবাবদিহিতাও তেমন প্রবল বা বাধ্যতামূলক নয়। বরং সেখানে ক্ষমতাসীনের তোষামোদই মুখ্য।

কিন্তু খিলাফতে খলীফাকে প্রত্যক্ষভাবে জনগণ এবং আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। খিলাফতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে সকল পর্যায়ের শাসকগণ সাধারণ জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। তুলনামূলক অধঃস্তন শাসক তার ঊর্ধ্বতন পদের শাসকের কাছে যেমন তেমনি উর্ধ্বতনও অধঃস্তনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। চূড়ান্তভাবে তারা প্রত্যেকে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান ও জনগণের নিকট জবাবদিহি করেন। স্বয়ং রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানও জবাবদিহির উর্ধ্বে থাকেন না। তাকেও জনগণ এবং সকল অধঃস্তনের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। আর সামগ্রিকভাবে তাদের সকলের মধ্যে আখিরাতে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার সুতীব্র চেতনা কাজ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺবলেন,

فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته

"শাসক যিনি জনগনের ওপর দায়িত্বশীল, তিনি তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১৯. রাষ্ট্রের সীমা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সীমা সীমাবদ্ধ। এ রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই স্থির থাকে। অন্যকোনো দেশ আক্রমণ করা বা দখল করা এর সাধারণ নীতিবহির্ভূত হলেও বাস্তবে অনেকেই এ নীতি মানে না। তারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো দেশে আক্রমণ পরিচালনা করে থাকে। আধুনিক আমেরিকার ইরাক আক্রমণ এর জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু খিলাফতের পরিধি সমস্ত বিশ্ব। এটি বিশ্বব্যাপী ইসলামকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হলেও খিলাফত কোনো ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। সীমানাগত সংকীর্ণতা এ রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করে না। ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল, জাতি, ধন, সম্পদ নির্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা করে পাঠিয়েছেন আর মুসলিমদের দিয়েছেন শাসন পরিচালনার সঙ্গত অধিকার। যেমন তিনি বলেন- 'তিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদের পৃথিবীর খিলাফত দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা বিজয়ী হবে, শাসন ক্ষমতা তোমাদেরকেই দেয়া হবে, যদি তোমরা মুমিন হও। (আল-কুরআন)

তাছাড়া মানুষের উৎসগত বিবেচনাতেও বিশ্বরাষ্ট্রের এই ধারণা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يا أَيُّهَا النَّاسُ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।" (সূরা হুজুরাত: ১৩)

২০. নীতি-নৈতিকতা:গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নীতি-নৈতিকতার কোনো স্থান নেই। এখানে জগণের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু খিলাফতে নীতি-নৈতিকতা সবই আছে। প্রত্যেকে নাগরিক ইসলামী নৈতিকতার সুস্পষ্ট বিধানের অনুসরণ করতে বাধ্য। এখানে জনগণের নৈতিকমান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২১. রাজনৈতিক দল: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চলু রয়েছে। পক্ষান্তরে খিলাফত ব্যবস্থায় পার্টি প্রথার অবসাননিশ্চিত করে। সেখানে রাজনৈতিক দল থাকতে পারবে না, একটি মাত্র শ্রেণী থাকবে যারা সরকারের বিরোধিতা করবে না। বরং খলীফা যদি আল্লাহর আনুগত্য থেকে সরে যায় তাহলে তাকে পদচ্যুত করবে।

২২. পররাষ্ট্র নীতি: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। স্বার্থসিদ্ধি এবং নিজেদের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এ রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি হলো- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। শান্তির জন্য আপোষমূলক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২৩. জনগণ: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ যে কোনো ধর্মানুসারী এমনকি ধর্মহীনও হতে পারে। কিন্তু খিলাফত ইসলামী আদর্শের অনুসারী মুসলিম জনগণের রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে জনগণ সাধারণত মুসলিম কিংবা বেশিরভাগই মুসলিম। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরাও থাকবেন, তবে তারা জিযিয়া কর পরিশোধ করবেন এবং ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবেন। কেননা আল্লাহ ইসলামী আদর্শের অনুসারী মানুষদেরকেই রাষ্ট্রক্ষমতা দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। তিনি বলেন,

وعد الله الذين امنوا منكم وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفْهُمْ فِي الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ص
وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارتضى لهم وليبدلتهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا طَ يَعْبُدُونَنِي لا يُشركون بي شيئا ط
ومن كفر بعد ذالِكَ فَأَوْلَئِكَ هُم الفَاسِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেমন তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের আগের লোকদের আর তিনি তাদের জন্য অবশ্যই তাদের দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। তাদেরকে তিনি ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না, এরপর যারা অবিশ্বাসী হবে তারা তো সত্যত্যাগী।"। সূরা নূর: ৫৫)

২৪. সরকার: পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠিত হয় পুঁজিবাদী নীতিতে। এ সরকার মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে যে কোনো ধর্মের লোক নিয়ে গঠিত হতে এবং যে কোনো আইনে পরিচালিত হতে পারে। খিলাফতে ব্যবস্থা শুধু মুসলিম নামধারী লোকদের নিয়েই গঠিত হয় না বরং সরকারের সব সদস্য ইসলামী অনুশাসনের অনুসারী হয়। তাদের পরিচালিত শাসনব্যবস্থা হয় পুরোপুরি ইসলামসম্মত। এ সরকারের সংবিধান রচিত হয় কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার রাষ্ট্রের সব পর্যায়ে আল্লাহর আইন ও রাসূলের সে আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ إِن مَّكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور "(যারা আল্লাহর দীনকে সাহায্য করে) আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে তারা সালাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, সং কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। আর সকল কাজের প্রতিদান নিশ্চয় আল্লাহরই অধিকারে।" (সূরা হজ: ৪১)

২৫. শাসনব্যবস্থা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা নির্ধারিত হয় শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছায়। তারা তাদের পছন্দ ও সুবিধা বিবেচনা করে যে কোনো পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা চালু করতে পারেন। খিলাফতে শাসন পদ্ধতি ও নীতি কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক। শাসক শ্রেণী বা অন্যকোনো মানুষ রাষ্ট্রের সংবিধান ও শাসন পদ্ধতি রচনার অধিকার রাখে না। এ রাষ্ট্রের সব আইন- কানুন, নীতি আদর্শ ও বিধিবিধানের উৎস শুধুই কুরআন মাজীদ ও হাদীস। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'আর যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা-শাসন পরিচালনা করে না, তারা কাফির। (সূরা মায়িদা: ৪৪)।

তিনি আরো বলেন,

فلا وربِّكَ لا يُؤْمِنُون حتى يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يحِدُوا في أنفسهم حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ। তারা কখনোই মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার ঝগড়া বিবাদের বিচার-ফয়সালার ভার আপনার ওপর অর্পণ করে। এরপর নিজেদের মনে কোনো রকম দ্বিধা-সংশয় পোষণ না করে না আপনার ফয়সালা পুরোপুরিভাবে মেনে নেয়।" (সূরা নিসা। ৬৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বলেন, "তোমাদের মধ্যে আমি দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি এ দুটি আকঁড়ে ধরো কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটো হলো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ।" (মিশকাত)

অবশ্য যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কোনো সমস্যা সমাধানের জন্যে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার এ রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের রয়েছে। আর এ সিদ্ধান্ত যেহেতু কুরআন সুন্নাহর আলোকেই গৃহীত হয় সে কারণে খিলাফতে শাসনব্যবস্থা কোনোভাবেই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

২৬. আদর্শিক রাষ্ট্র: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে কোনো বিশ্বজনীন আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনের সাথে সাথে এর আদর্শেও পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু খিলাফতে অঞ্চল, বর্ণ বা জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো রাষ্ট্র নয় বরং এ রাষ্ট্র হলো ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান পোষণ এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে যে কেউ এ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেতে পারে। এমনকি ঈমান না এনে শুধু জিযিয়া প্রদানের অঙ্গীকারে অমুসলিমরাও এ রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র সবাইকে সমান নিরাপত্তা দেয়। এ রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে না। বরং ইসলামের শাশ্বত আদর্শের আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শকেই সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা করে।

২৭. আহবায়ক রাষ্ট্র:গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে কোনো আদর্শ বা ধর্মের দিকে আহ্বান করাকে তাদের দায়িত্ব মনে করে না। কিন্তু খিলাফতের একটি অনুপম দিক হলো, এ রাষ্ট্র একটি দায়িত্বশীল আহবায়ক রাষ্ট্র। বিশ্বের সব শ্রেণীর ও সব এলাকার মানুষকে এ রাষ্ট্র সৎকাজের দিকে আহ্বান জানায়। কেননা এ রাষ্ট্রের জনগণ মুসলিম আর এর সরকার ও শাসন পদ্ধতি ইসলামী। আর মুসলিমদের জাতীয় দায়িত্ব হলো মানুষকে হিদায়াতের পথে আহ্বান জানানো। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كنتم خير أمة أخرجت للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وتنهون
عن المنكر وتُؤْمِنُون بالله ولو أمن أهل الكتاب لكَانَ خَيْرًا لَهُم
"তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখ। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত তাহলে তাদের জন্যই ভালো হতো।" (আলে ইমরান ১১০)

২৮. কল্যাণ রাষ্ট্র: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সর্বজনীনভাবে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে না। কখনো তা শাসকগোষ্ঠীর কখনো বা কোনো নির্দিষ্ট পরিবারের কল্যাণ সাধন করে। কিন্তু খিলাফত এক অসাধারণ মানবকল্যাণ সংস্থা। মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যেই এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনে, উপার্জনে, ভোগ ও বন্টনে যাতে মানুষের স্বার্থরক্ষা পায় এবং কোনোক্রমেই জনস্বাস্থ্য নষ্ট না হয় ইসলামী রাষ্ট্র গভীর মমতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে তা পর্যবেক্ষণ করে। এখানে শাসনের নামে নির্যাতন চালানো হয় না। কোনো বিধান বা অধ্যাদেশ জারি করে জনগণকে বিপদে ফেলা হয় না। কোনোভাবেই মানুষের শান্তি নষ্ট করা হয় না। বরং খিলাফত মানুষের শান্তি রক্ষার জন্যে কাজ করে যায়।

২৯. সুবিচার :গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকে না। শাসকগোষ্ঠীর জন্য হলে এক রকম বিধান আর জনগণের জন্য হলে ভিন্ন বিধান অনুসরণের রীতি এ রাষ্ট্রসমূহে দৃষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতাবান লোক অপরাধের জন্য শাস্তি পায় না, আর ক্ষমতাহীন লোক বিনাঅপরাধে শাস্তি পেয়ে থাকে। খিলাফত ন্যায়নীতি ও সুবিচার ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এখানে সব ক্ষেত্র ও পর্যায়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকে। বিচারব্যবস্থা প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের নিষ্ঠার সাথে আদল বা সুবিচার অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفُسِكُمْ أو الوالدين والأقربين إن يكن غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بهما فلا تَتَّبِعُوا الهوى أن تعدلوا وإن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় অথবা তোমাদের মাতা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হোক অথবা গরীব হোক আল্লাহ ভাদের উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচারে তোমাদের কামনা হাসনার অনুসরণ কর না। তোমরা যদি

ঘরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল না পাশ কাটিয়ে যাও, তাহলে জেনে রেখ, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সকল খবর জানেন।" (সূরা নিসা: ১৩৫)

৩০. পরামর্শ ব্যবস্থা:গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্বাহীক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির ইচ্ছায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। কারো কোনো পরামর্শ দেয়ার বা গ্রহণের সুযোগ থাকে না। বরং যাদের পরামর্শ দেয়ার বা সমালোচনা করার কথা তারা নির্বাহী ব্যক্তিত্বের তোষামোদ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োজিত হয়। খিলাফত কোনো একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব সিদ্ধান্তে খিলাফত পরিচালিত হয় না। এটি পরিচালিত হয় যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গঠন করা পরামর্শ পরিষদের পরামর্শক্রমে। শাসন কাজে সহযোগিতার জন্যে খিলাফতের নির্দিষ্ট পরামর্শ পরিষদ থাকে। এ পরামর্শ পরিষদের নাম মজলিসে শূরা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين

"হে রাসূলুল্লাহ,ﷺ কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (পরামর্শ শেষে) আপনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। যারা (আল্লাহর ওপর) ভরসা রাখে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়িম করে, তাদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে এবং তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা শূরা: ৩৮)

৩১. ধর্মীয় স্বাধীনতা : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে না। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষিত রাষ্ট্রেও সংখ্যালঘু মানুষেরা ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হন। নিজেদের অধিকার, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর ধর্মীয় হুকুম-আহকাম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারেন না। খিলাফত ব্যবস্থায় সব নাগরিকের নিজ নিজ ধর্মপালনের অবাধ সুযোগ থাকে। কেউ কারো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। জোর করে ধর্মান্তরিত করার বিধান খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থায় নেই। আল্লাহ তা'আলা ধর্মপালনের স্বাধীন অধিকার ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين قد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعُروة الوثقى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"দীনের ব্যাপারে কোনো জোর প্রয়োগ নেই। মিথ্যা পথ হতে সত্য পথ আলাদা হয়ে গেছে। কাজেই যে আল্লাহবিরোধী শক্তিকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করেছে যা কখনো ভাঙবে না। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।" (সূরা বাকারা: (২৫৬)

قل يا أيها الكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدُ وَلَا أَنَتْمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِين

"হে রাসূল (স)! আপনি বলুন, 'হে কাফিররা। আমি তার ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর, তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর তার। আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, আমার জন্য আমার দীন।" (সূরা কাফিরুন: ১-৬)

৩২. জীবনের নিরাপত্তা :গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কথা বলে। কিন্তু অনুসৃত ভুলনীতি ও বিধিবিধানের কারণে প্রায়ই জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সাধারণ ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে তারা যে কোনো রকমের খুন-খারাবি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে অভিনন্দিত করে। খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা তার নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এতে অন্যায় হত্যাকাণ্ড, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

"যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তোমরা তাকে হত্যা কর না। তবে আইনসম্মত হত্যার কথা স্বতন্ত্র।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصِ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بالحر والعبدُ بالعَبْدِ والأنثى بالأنثى

"মুমিনগণ! হত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্যে কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী।" (সূরা বাকারা: ১৭৮)

إنما جزااء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الأجرة عذاب عظيم

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে 'তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এটা হলো তাদের পার্থিব শাস্তি। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি।" (সূরা মায়িদা। ৩৩)

৩৩. সম্ভ্রমের নিরাপত্তা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। কেননা এ রাষ্ট্রসমূহ তথাকথিত উদার সংস্কৃতি আর অনৈতিকতা সমর্থন করে বলে মানুষের পাশব প্রবৃত্তি সদাক্রিয়াশীল থাকে। আর এমন পরিস্থিতিতে মানুষের ইজ্জত আবরু সবসময় হুমকীর মুখে থাকে। খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের সম্মান, সম্ভ্রম ও ইজ্জতের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। কেউ কারো গীবত করতে পারে না। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ উত্থাপিত হলে উত্থাপনকারীকে শাস্তি দেয়া হয়। অশালীন ও অশ্লীল কাজ হারাম করে মানুষের সম্ভ্রম রক্ষার নিখুঁত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পশ্চাতে নিন্দা, গীবত ও উপহাস নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন, ولا تَنَابَزُوا بالألقاب طبئس الاسم الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمان

"(হে মুমিনগণ!) তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা অত্যন্ত খারাপ।" (সূরা হুজুরাত: ১১)

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يسخر

قوم من قوم عسى أن يكونوا خَيْرًا من مِّنْهُمْ وَلانِسَاء مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يُكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

"হে মুমিনগণ। কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে ভালো হতে পারে। আর কোনো নারীও যেন অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী নারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে।" (সূরা

হুজুরাত: ১১)

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

"তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না।" (সূরা হুজরাত: ১১)

ولا تجسسوا

"তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না।" (সূরা হুজুরাত ১২)

بِاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ز إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثم

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাক। কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ।" (সূরা হুজুরাত ১২)

ولا يغتب بعضكم بعضا ط ايُحِبُّ احدكم أن يأْكُلَ لَحْمَ اخيه ميتا فكرهتموه

"(হে মুমিনগণ!) তোমরা একে অপরের পেছনে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশতো খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর।" (সূরা হুজুরাত ১২)

মিথ্যা অপবাদকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحصنت ثم لم يأتوا باربَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ج وأُولئِكَ هُمُ الفَسِقُونَ

"যারা পবিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে কিন্তু চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না। তারাই তো সত্যত্যাগী।" (সূরা নূর:৪)

৩৪. সম্পদের নিরাপত্তা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঘুষ, আত্মসাৎ, সুদসহ যে কোনো অপরাধ এখানে অভিনন্দিত হয় যদি তা আইনের চোখ এড়িয়ে করা যায়। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাবে মজুদদার, সুদখোর মহাজনরা সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে শোষণ করে। খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা তার নাগরিকদের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অর্থ আত্মসাৎ, অধিকারহরণ, হারাম উপার্জন প্রভৃতি হারাম ঘোষণা করে এবং এ সবের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ বলেন-

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مِّنكُمْ

"মুমিনগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ কর না। তবে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে লেনদেন করতে পার।" (সূরা নিসা: ২৯)

৩৫. আখিরাত:গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন বা শাসনপরিচালনার কোনো পর্যায়ে আখিরাতের চিন্তা ক্রিয়াশীল থাকে না। বরং সর্বোতভাবে একে উপেক্ষা করা হয়। খিলাফত আখিরাতমুখী আধ্যাত্মিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। নাগরিকদের পার্থিব স্থিতি, সমৃদ্ধি ও শান্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি আখিরাতের মুক্তি লাভের ক্ষেত্রেও খিলাফত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানেরর মূলনীতি ও বিধিবিধানে এমন কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না যা আখিরাতে নাগরিকদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। কেননা ইসলামী জীবন-দর্শনে আখিরাতের সফলতাই মূল সফলতা।

৩৬. অর্থব্যবস্থা: গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিপুল অসম অর্থনীতি চালু থাকে। এরপুঁজিপতিরা সকল অর্থ ও বিত্তের মালিক থাকে। যারা গরীব তারা আরো গরীব হয়। যারা বিত্তবান তাদের বিত্তের পাহাড় বৃদ্ধি পেতেই থাকে। খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুষম অর্থনীতি বহাল থাকে। এর অর্থব্যবস্থা হয় ভারসাম্যপূর্ণ। এতে কারো পক্ষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি কেউ নিঃস্বও থাকে না। যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রে কল্যাণমুখী অর্থনীতি চালু করা হয়েছে।

৩৭. রাজনৈতিক অধিকার: পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অনেক বিধিনিষেধের জালে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করে। তারা স্বাধীন সমালোচনা, মত প্রকাশ বা অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দেয়। নির্দ্বিধায় ও নির্বিঘ্নে সে নিজের মত প্রকাশ করতে পারে। এ রাষ্ট্রে সীমালঙ্ঘন না করে ব্যক্তি সব রকম রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। আর অবাধ যাতায়াত ও ভোট প্রদানের স্বাধীন অধিকার থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الإسلام بغير العدل

"ইসলামে ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত কাউকে বন্দি রাখা যায় না।"

তিনি আরো বলেন- 'জালিম শাসকের সামনে সত্য বলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিহাদ।'

৩৮. মৌলিক অধিকার: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিলেও তা ব্যক্তিগতভাবে পূরণেরই নির্দেশনা দেয়। রাষ্ট্র দায়িত্ব নিয়ে এ অধিকার পূরণের কোনো ব্যবস্থা করে না। খিলাফত নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার পূরণের নিশ্চয়তা

দেয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। খিলাফত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এ সব অধিকার পূরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর অর্ধজাহানের খলীফা উমর বিন খাত্তাব (রা) এজন্যেই বলেছিলেন- 'যদি ফুরাতের তীরে কোনো একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায় সে জন্যে আমি উমরকেই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।'

৩৯. ভিন্নধর্মের নাগরিকদের অধিকার:গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মের নাগরিকরা সাধারণত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রকাশ্যে অধিকার দেয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও অধিকার ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে তাদেরকে যথাযথ স্বীকৃতি ও গুরুত্ব দেয়া হয় না। খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা তার মুসলিম নাগরিকদের মতো অমুসলিম নাগরিকদেরও জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেয়। এজন্যে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হয়। যোগ্যতা অনুযায়ী অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রে কাজের সুযোগ পান। তারা কোনো নিপীড়ন ও নিগ্রহের শিকার হন না। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার নির্দেশ করে উমর বিন খাত্তাব (রা) সিরিয়ার গভর্নর আবু ওবায়দাকে নির্দেশ দেন, "তুমি মুসলিমদের নিষেধ কর অমুসলিমদের ওপর অত্যাচার, প্রহার ও তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করতে।"

কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র হলো এক আদর্শিক ও মানবিক রাষ্ট্র। সব শ্রেণীর মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও অধিকার আদায় নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য। যে জন্যে মানবতার মুক্তির জন্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা অনিবার্য।

৪০. আইনের দৃষ্টিতে সাম্য : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি ব্যর্থ। এখানে শাসক ও ক্ষমতসীনদের জন্য এক রকম আইন, আর ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষদের জন্য ভিন্ন আইন। অথবা আইন একরকম হলেও প্রয়োগগত ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজ করে। খিলাখতে শাসক শাসিত, মুসলিম অমুসলিম, ধনী-নির্ধন, সাদা-কালো, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত- নির্বিশেষে সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান বিবেচিত হন। ক্ষমতা, বিত্ত, ধর্ম বা বর্ণের জন্য কেউ কোনো বিশেষ সুবিধা পায় না, আবার কাউকে প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিতও করা হয় না। আইনের স্বাভাবিক যাত্রায় ক্ষমতা বা বিত্ত কিংবা ধর্ম কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنَّ اللهَ نِعِمَّا يعظكم به

"তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে তখন তা করবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে উপদেশ দান করেন, তা কতই না উত্তম।" (সূরা নিসা: ৫৮)

৪১)শিক্ষাব্যবস্থা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্বাভাবিক অবস্থায় ধর্মহীন শিক্ষা চালু করে। খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থা হয় ইসলামী আদর্শ, নীতি, দর্শন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও জীবনব্যবস্থা ভিত্তিক। বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, সাহিত্য, কলা তথা জ্ঞান চর্চার সকল শাখাই এর আওতাভুক্ত থাকে কিন্তু কোনো শাখার শিক্ষাই ইসলামী আকীদা ও চিন্তাধারা বিরোধী হয় না। বরং এর বিন্যাস ও বিস্তৃতি ঘটে ইসলামের নির্দেশনার আলোকেই। কেননা ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন ছাড়া

প্রকৃত মুসলিম আশা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ছাড়া প্রকৃত اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَر خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ علم بالقلم - عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ الأَكْرَمُ الَّذِي علم

(হে রাসূল, সা.) পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পড়ুন এবং (জেনে রাখুন) আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা, যা সে জানত না। (সূরা আলাক: ১-৫)

৪২. নির্বাচন ও প্রার্থিতা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি নিজেই প্রার্থী হতে পারে। নিজে বিজয়ী হওয়ার জন্য যে কোনো ধরনের চেষ্টা করতে পারে। অর্থ, ক্ষমতা ও সামাজিক প্রভাব নির্লজ্জভাবে ব্যবহার, নিজেকে যোগ্য প্রমাণের হাস্যকর নানা চেষ্টা এবং নগ্ন আত্মপ্রচার এ রাষ্ট্রের ক্ষমতালোভী ব্যক্তিদের প্রধান কাজে পরিণত হয়। খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচন আছে কিন্তু কোনো প্রার্থিতা নেই। এখানপ কোনো ব্যক্তি পদ প্রার্থনা করতে পারে না। বরং সকলের জন্যে উন্মুক্ত নির্বাচনে নাগরিকরা পছন্দমতো যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করার সুযোগ পায়। মহানবী ﷺ বলেন,

أَنَا وَاللَّهِ لا نُولى لاعْمَالِنَا هَذَا أَحَدًا سَأَلَهُ أَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ

"আল্লাহর কসম। যে পদ চায় তাকে আমরা কোনো পদ দেই না।"

কেননা যে পদ চায় তার মধ্যে পদের প্রতি লোভ কাজ করে। সে পদ ব্যবহার করে কোনো পার্থিব সম্মান, প্রতিপত্তি বা বিত্ত কিংবা ক্ষমতা আশা করে। এমন আশাই মানুষকে ক্ষমতার অপব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের একটি প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার গোত্র, জাতি ও বাদশাহর (মুসলিমদের জন্য খিলাফতের) মাধ্যমে গঠিত ছিল, যা ছিল তাদের নিজ নিজ ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ধারাবাহিকভাবে এই সবকিছু পরিবর্তন করে দেয়। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে দুটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অপরটি কোম্পানি। অতঃপর পুরো বিশ্বের মানুষকে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়। যখন কোনো রাষ্ট্রের মানুষ বিশেষ ঐতিহাসিক কৌশলের মাধ্যমে কোম্পানি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে চলে আসে, তখন সেই রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাদেরকে বৈশ্বিক সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘ, WTO, IMF ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে মিলিত করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার তিনটি স্তর রয়েছে:

১. নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার :ব্যক্তি ও সামাজিক স্তর।

২ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার: রাষ্ট্রীয় স্তর।

৩ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার: আন্তর্জাতিক স্তর।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার: ব্যক্তি ও সামাজিক স্তর

যেকোনো সমাজ মূলত দুই ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক এবং অপরটি পুরুষ ও নারীর মাঝে সম্পর্ক। এই চারটি পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা। সমাজ অস্তিত্বে আসে। গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য

ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে। যার ফলে সমাজের স্বাভাবিক ও স্বভাবজাত দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যায়।

ব্যক্তি :ইনসান থেকে হিউম্যান ও হিউম্যান থেকে প্রফেশনাল

আসমানি ধর্মের অনুগত মানুষ নিজেকে 'আবদ' বা 'বান্দা' হিসেবে গণ্য করে। যার উদ্দেশ্য উত্তম কাজ ও ইবাদতের মাধ্যমে রবের সন্তুষ্টি অর্জন করা। ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ইউরোপেও এই আদর্শই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর মানুষ আল্লাহর বান্দা হওয়ার পরিবর্তে এমন হিউম্যান হয়ে যায়, যার লক্ষ্য শুধুই বস্তুগত উন্নতি করা। এই উন্নতির জন্য তার দরকার ছিল পুঁজি ও ধারাবাহিক পুঁজি বৃদ্ধি করা। যার জন্য এখন সে নিজের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ব্যয় করতে শুরু করে। পুঁজি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সে কোনো ধর্মীয় নৈতিকতার প্রয়োজন বোধ করে না; বরং সে সর্বদার জন্য এক পেশাদারি চরিত্র গ্রহণ করে নেয়। পেশাদার মানুষের ইমান হয় তার পেশা অনুযায়ী, সে পেশার প্রতি একনিষ্ঠতার সাথে হিউম্যানের সেবা করে, যার বিনিময়ে তার পুঁজি বৃদ্ধি পায়। এই সেবা সে কোনো ধর্ম, রং বা বংশের মাঝে পার্থক্য করা ব্যতীত নির্বিশেষে সমস্ত হিউম্যানের জন্য করে থাকে;চাই তার এই সেবা কাফিরের জন্য হোক বা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে হোক। প্রফেশনালিজম বা পেশাদারির দ্বারা মুসলিমদের বন্ধুত্ব-শত্রুতার বিশ্বাস বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়।

পুরুষ ও নারীর সমতা

যেহেতু এখন সমস্ত হিউম্যানের লক্ষ্য পুঁজি বৃদ্ধি করা এবং পুরুষ ও নারী উভয়েই হিউম্যান। আর যেহেতু স্বাধীনতা ও সমতা হিউম্যানের মৌলিক লক্ষ্য, তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষকে পুঁজি কামানোর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিউম্যানকে এই বিশ্বাস করানো হয় যে, পুঁজি বৃদ্ধির জন্য

নারীকেও তার স্বভাবজাত গণ্ডি থেকে বের হতে হবে। কেননা ঘরে বসে থেকে পুঁজি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তাকে বিশ্বাস করানো হয় যে, নারী-পুরুষ উভয়েরই নিজ নিজ কর্তব্য বাছাই করে নেওয়া উচিত। যেভাবে পুরুষ পেশাদার, তেমনই নারীকেও পেশাদার হওয়া উচিত। এমনকি ঘরের দায়িত্বও তাকে পেশাদারির মতো করা উচিত। শুরুতে দাবি করা হয় যে, পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান দায়িত্ব আদায় করবে। যখন বাচ্চার বয়স সাড়ে তিন বছর হয়ে যাবে, তখন বাচ্চাকে নার্সারি বা ডে-কেয়ার চাইল্ড স্কুল নামক পেশাদার আস্তানাগুলোতে সোপর্দ করে দেওয়া হবে। এবং এই বাচ্চাকেও পেশাদার হিউম্যান বানানোর জন্য আধুনিক শিক্ষা আবশ্যক করে দেওয়া হয়। যাতে ছোট বয়স থেকেই সে পেশাদারির শিক্ষা পেয়ে বড় হয়ে ওঠে।

এভাবেই এই সমাজকে সোল সোসাইটি[1] ও কর্পোরেট সমাজে পরিবর্তন করে ফেলা হয়। যেখানে সমস্ত হিউম্যান কোনো লিঙ্গের পার্থক্য ছাড়াই কোম্পানির ম্যানেজার, ডক্টর ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়া শুরু হয়। সোল সোসাইটি ও কর্পোরেট সমাজ প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আবশ্যকীয় কর্তব্য।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কাবায়িল ও গোত্রীয় ব্যবস্থার বিপরীত

অতীতকাল থেকেই পরিবার ও বংশ সমাজের মূল ও স্বাভাবিক শক্তি ছিল। যার ভিত্তি পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র এই স্বাভাবিক শক্তিকে ধ্বংস করা এবং ঐক্যের দৃঢ়তা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এই শক্তি তিন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

1. বৈবাহিক সম্পর্ক
2. জন্ম নেওয়া সন্তান

[1]আগেকার সমাজগুলোতে দ্বীন, বংশ এবং ঐতিহ্যগত একটি সামাজিক বন্ধন ও শক্তি ছিল। যেখানে ইচ্ছা করলেই কেউ কোনো অন্যায় কিংবা অপরাধ করতে পারত না। সামাজিক এই সংহতিকে নষ্ট করে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আমলাতান্ত্রিক যেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাকেই সোল সোসাইটি বলে।

3. সন্তান ও এতিমদের লালনপালন

এই শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য নারী স্বাধীনতা ও সমতার নামে নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়। মহিলাদের জন্য অর্থ উপার্জনের বাধ্যতামূলক পরিবেশ তৈরি করা হয় এবং প্রশাসনের কার্যক্রমের মাধ্যমে এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়, যার ফলে নারীরা তার মূল দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। চাকরির বাহানায় ঘর থেকে বের হয়ে সে বংশীয় সম্পর্ক ও সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষার বাহানায় কমবয়সী বাচ্চাদেরকে মায়ের ভালোবাসা ও ব্যক্তিগত পরিচর্যা থেকে বের করে নার্সারির অপ্রাকৃতিক পরিবেশে সোপর্দ করে দেওয়া হয়। পেশাদার শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে বংশ-সমাজ থেকেও বেশি পেশার প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত বানিয়ে দেওয়া হয়। এতিমদেরকে সমাজে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিপালনের মাধ্যমে মায়ের ঘাটতি পূরণের পরিবর্তে তাদের জন্য আলাদা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। নতুন প্রজন্ম থেকে ঘরের জ্ঞানী ও দ্বীনদার বৃদ্ধ পিতামাতাকে দূর করে পেশাদার সংস্থা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একাধিক বিবাহকে সর্বাবস্থায় অপরাধ সাব্যস্ত করে জিনা, ব্যভিচার ও চারিত্রিক অধঃপতনের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। এই সবই গণতন্ত্রের সেই সব কার্যক্রম, যার দ্বারা বংশীয় ঐক্যকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক ঐক্যের বিলুপ্তি ও দায়িত্বহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা

অতীত জমানার গোত্র ও বংশীয় সমাজে এমন স্বভাবজাত শক্তি থাকত, যা সমাজের সদস্যদের দেখাশুনার পাশাপাশি তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম ছিল। ইসলাম এই স্বাভাবিক শক্তিগুলোকে বিলুপ্ত করার পরিবর্তে তাদেরকে শরিয়াহর অনুগত করে সমাজকে পবিত্র করে নেয়। সেই শক্তিকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের দায়িত্ব আরোপ করে সমাজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সেই সমাজের দায়িত্ব ছিল শরিয়াহর বিধান বাস্তবায়ন, আল্লাহর হুদুদ প্রয়োগ এবং জিহাদের জন্য সদস্য ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করা। আর রাষ্ট্র সর্বদা এই কাজের ধারা চালু থাকার ব্যাপারে তদারকি করত। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন সামাজিক সিস্টেম বাস্তবায়ন করে, যেখানে সমাজের মূল শক্তি ও

ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নিয়ে নতুন গঠিত শক্তিকে জায়গা দিয়ে দেওয়া হয়, যেগুলোর সাথে সমাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এরই অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল, পুলিশ ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পার্টির কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের লাগাম কৃত্রিম শক্তির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। সময় পার হওয়ার সাথে সাথে আসল শক্তিগুলো হয়তো হতাশ হয়ে পিছু হটে অথবা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কৃত্রিম শক্তির সাথে সম্পর্ক করা এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে সমাজের বাকি সদস্যদেরকে জীবিকা তালাশ ও পুঁজি বৃদ্ধি করার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ফলে সমাজ পরিচালনার সব দায়িত্ব এমন শ্রেণির হাতে দেওয়া হয়, যাদেরকে এই দায়িত্ব পালন নয়। বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোলামির জন্য গঠন করা হয়েছে। তারা পুরো সমাজকে দায়িত্বহীন সমাজে পরিণত করে। এর বাস্তবিক চিত্র মুসলিম সমাজে তখনই পরিলক্ষিত হয়, যখন কোনো শক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের চেষ্টা করে। কারণ তখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ল এন্ড অর্ডার তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

অনুভূতিহীন সমাজ

সমাজের স্বভাবজাত শক্তিগুলোর ক্ষমতা নিঃশেষ করে ল এন্ড অর্ডার বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্রীয় কর্তাদের দখলদারিত্বের স্বাভাবিক ফল ছিল সেই সমাজ, যা পূর্বে জিহাদের জন্য জনবল ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, এখন তারা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। তারা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। সমাজ তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও অশ্লীলতার সামনে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। রাষ্ট্র সমস্ত বাতিল আদর্শ ও অশ্লীলতা যখন ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে শুরু করে।

কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত সমাজ

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক কর্পোরেট সমাজে মসজিদ, মাদরাসা ও দারুল ইফতার কোনো গুরুত্ব নেই। অথচ ইসলামি রাষ্ট্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলোরই মৌলিক গুরুত্ব ছিল। মসজিদে সমাজের মানুষের সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হতো এবং শরিয়াহর বিধান বর্ণনা করা হতো। মাদরাসাতে মুসলিম বাচ্চাদেরকে ইসলামি শিক্ষা দেওয়া হতো এবং দারুল ইফতা দ্বীনের আলোকে জীবন পরিচালনার বিধান ও নিত্যনতুন সংকটগুলোর সমাধান সমাজের সামনে পেশ করত। এই দায়িত্বগুলো সমাজের উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোই আজাম দিত। কাজিদের অধীনে ফৌজদারি মামলাগুলোর সমাধানও এখান থেকে করা হতো। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো অতীতের স্মৃতিবিজড়িত বিল্ডিংয়ে পরিণত হয়েছে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার: রাষ্ট্রীয় স্তর

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা ছিল নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সবচেয়ে বড় সফলতা। এই রাষ্ট্রের প্রথম কাজ মানুষকে কোনোভাবেই আল্লাহ তাআলার বান্দা হতে সুযোগ না দেওয়া এবং ব্যক্তিগত উন্নতিকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়ে দেওয়া। আইন প্রণয়ন করে ফরাসি বিপ্লবের প্রস্তাবিত ব্যক্তিগত, সামাজিক ও মানবিক ইচ্ছাকে হিফাজত করা এবং অস্ত্রের শক্তিতে তা বাস্তবায়ন করা। এর বিরুদ্ধে তোলা প্রতিটি মাথাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। আর এই কাজের জন্য 'ল এন্ড অর্ডার' ও 'রিট অফ দ্যা স্টেট'-এর মতো পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বিতীয় কাজ, বসবাসকারী সমস্ত নাগরিকদের থেকে তার ব্যবস্থাপনাগত সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া এবং তাকে অস্ত্রহীন ও দুর্বল বানিয়ে দেওয়া। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যার জন্য তাকে তৈরি করা হয়েছে, তা হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবা করা।

ল এন্ড অর্ডার

ব্যবস্থাপনাগতভাবে রাষ্ট্র আইনের বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা করে, যা মূলত মানুষের 'সাধারণ ইচ্ছা' এর নাম। আইনকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে মানুষের বানানো নীতি মানুষের ওপরই বাস্তবায়ন করা হয়, যা 'গাইরুল্লাহর হুকুম' বা আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধান ব্যতীত ফয়সালা করার বাস্তবিক রূপ। এই আইনগুলো বাস্তবায়নের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতি জেলাতে তিনটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় আমলা, আদালত ও পুলিশ। এই তিন শক্তিকে সমাজের মূল শক্তিগুলো থেকেও অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়; যাতে তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 'ল এন্ড অর্ডার' অর্থাৎ নীতি আদেশ সমাজে বাস্তবায়ন করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় আদেশ (রিট অফ দ্যা স্টেট)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়, যা মুসলিমরা আল্লাহ তাআলার বিধানকে দিয়ে থাকে। যখন কোনো শক্তি হিউম্যানের সাধারণ ইচ্ছা বা আইনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঁচু করে, তখন রাষ্ট্রীয় রিটের নামে সমস্ত সরকারী সংস্থা এই আওয়াজকে বন্ধের জন্য এগিয়ে আসে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তার সাংবিধানিক ধারা-উপধারা

এই সিস্টেমের লাগাম নিজের হাতে রাখার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কঠোর মূলনীতি চালু করার পরিবর্তে বিভিন্ন ধারা তৈরি করা হয়। এই ধারা ও শর্তকে সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের

কাছে এতটাই মর্যাদাপূর্ণ করে দেওয়া হয়, যার ফলে সেই সমাজের মূল লক্ষ্যই হয়ে যায় এই আইন বাস্তবায়ন করা। অতঃপর ইনসাফ বাস্তবায়ন, মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব আদায়ের মতো বিষয়গুলো এই আইনের মোকাবিলায় পারিপার্শ্বিক অবস্থানে চলে যায়। যার ফলে মানুষ ধারা-উপধারার ঘূর্ণিপাকে কঠিনভাবে আটকে যায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিকড়

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার নাম। গণতন্ত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদের জন্য প্রশাসনিক সাহায্যের ব্যবস্থা সহজ হয়ে যায়, যা তার স্বার্থ রক্ষা করবে। পুঁজিবাদের মধ্যে যেহেতু হিউম্যানের পারস্পরিক সম্পর্ককে ঠিক করার জন্য কোনো নীতি নেই, তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এভাবেই মধ্যযুগের অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলো, যা পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে এবং মানবাধিকার আন্দোলন, যা গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, এগুলো রাষ্ট্রীয় গুরে এসে একে অপরের সাথে একীভূত হয়ে যায়। ফরাসি বিপ্লবের পর গণতন্ত্রের মৌলিক কাজ হচ্ছে, পুঁজিবাদকে রক্ষা করা ও আয়-ব্যয়কে সহজ করে দেওয়া।

গণতন্ত্র জনগণের ইচ্ছাকে 'সাধারণ ইচ্ছা'র অনুগত করায়। যেহেতু সাধারণ ইচ্ছা মানুষের উন্নতি কামনা করে এবং তা পুঁজি ব্যতীত সম্ভব নয়, তাই গণতন্ত্র সাধারণ ইচ্ছার নামে পুরো সমাজকে পুঁজি বৃদ্ধিতে লিপ্ত করে দেয়। আর যারা এই লক্ষ্য থেকে ছুটে যায়, গণতন্ত্র তাদের পেছনে 'সাধারণ ইচ্ছা'র দোহাই দিয়ে লেগে যায়। হয়তো তাকে সকলের ইচ্ছার অনুগত হতে বাধ্য করে অথবা সমাজ থেকেই তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়; যার ফলে তার কোনো আশ্রয়ের জায়গা বাকি থাকে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম কাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করানো

যেমনটা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে, গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রে এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, যেখানে শিক্ষা লাভের পর পুরুষ-নারী মানুষ হওয়ার পরিবর্তে পেশাদার হিউম্যানে পরিণত হবে এবং পেশাদার সমাজকে সেবা দেবে। তবে প্রত্যেক পেশাদারদের মধ্যেই (Entrepreneurship) উদ্যোক্তা হওয়ার গুণ থাকা আবশ্যক। উদ্যোক্তা হওয়ার অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক পেশাদার অধিক পুঁজির জন্য নতুন নতুন ব্যবসার পদ্ধতি ও পথ খুঁজে বের করবে এবং এর জন্য রিস্ক (ঝুঁকি) নেবে। যে সমস্ত হিউম্যানের মধ্যে এই সক্ষমতা না থাকবে, সে এই সিস্টেমের মধ্যে অনেক পিছিয়ে যাবে।

রাষ্ট্রকে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির সাথে মিলিত করা

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে এবং এই ধারাবাহিকতাতেই নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তাদের মূল দায়িত্ব, প্রত্যেক রাষ্ট্রে নিজ দেশে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে এবং এর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করবে।

প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, আধুনিক অর্থনৈতিক বাজার প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, শেয়ার বাজার এবং কারেন্সির ওপেন মার্কেট থাকবে। অতঃপর সমস্ত বাধা দূর করে এমন নীতি প্রণয়ন করবে, যা অর্থনীতির গতিকে অনেক বৃদ্ধি করবে। অতঃপর ব্যক্তি মালিকানাধীন (প্রাইভেটাইজেশন) করার কাজ শুরু করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হবে। কৃষক ও শ্রমিকদেরকে দেওয়া সহায়তা ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ওপর কৃষি ও শিল্প ট্যাক্স বসিয়ে দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে IMI- ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহায্য নেওয়া হবে। অতঃপর এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হবে, যা নারী পুরুষ সবাইকে পেশাদার করে গড়ে তুলবে। এভাবেই ব্যক্তি, সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও

রাষ্ট্রকে এমন জালের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুগত করে দেওয়া হবে। যাতে এই রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে এর থেকে বের হওয়ার চিন্তা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার: আন্তর্জাতিক স্তর

ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও বাণিজ্যকে বৈশ্বিক ব্যবস্থার অনুগত করা (বিশ্বায়ন)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজকে নিজের অনুগত করার পর সেই রাষ্ট্র নিজেই নিজেকে জাতিসংঘ, IMI ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকের মতো সংস্থাগুলোর অনুগত বানিয়ে নেয়। ইংরেজিতে এই কাজের জন্য 'গ্লোবালাইজেশন' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এটি একটি বাস্তবতা যে, অতীতকাল থেকেই মানুষ আন্তর্জাতিক স্তরে সম্পর্ক রাখত; চাই তা ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক হোক অথবা যুদ্ধ বা ব্যবসার। মক্কার কুরাইশের বাণিজ্য, ইসলামের দাওয়াহ ও সাহাবিদের বৈশ্বিক বিজয়গুলো এর সাক্ষী। শুধু মুসলিমরাই নয়: বরং দুনিয়ার সমস্ত জাতি যেকোনোভাবেই হোক বৈশ্বিক সম্পর্ক রাখত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্বের সমাজগুলোর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আর পশ্চিমাদের গ্লোবালাইজেশনের মাঝে মৌলিক পার্থক্য কী?

অতীত সমাজে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো স্বভাবজাত কর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতো। যেখানে বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাথে চিন্তা ও জ্ঞান আদান-প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যের ধারা জারি থাকত। মৌলিকভাবে প্রত্যেক দেশ ও জাতির লক্ষ্য নিজের অর্থনীতির দিকেই থাকত। যেসব আসবাবপত্র তাদের কাছে না থাকত, তা অপর জাতি থেকে ক্রয় করে নিত। তেমনিভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্র পণ্য উৎপাদনে স্বাধীন ও সামাজিকভাবে নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বশীল ছিল। কিন্তু নতুন পশ্চিমা গ্লোবালাইজেশনে রাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করে সবাইকে পরস্পরের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেওয়া হয়। মুখাপেক্ষী বানানোর জন্য দুটি মাধ্যম গ্রহণ করা হয়, একটি পুঁজি ও অপরটি উৎপাদন। অর্থাৎ এক দেশ অপর দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাদের মুখাপেক্ষী করে ফেলবে অথবা এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উৎপাদিত পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেওয়া হবে।

এই কাজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা WTO-এর মাধ্যমে করা হয়। সমস্ত রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুমোদনের জন্য এই সংস্থার সদস্য হতে বাধ্য করা হয়। আর এভাবেই অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সদস্য হওয়ার পর এই সংস্থার নীতিগুলো মেনে নেয়। যার মধ্যে একটি নীতিকে ট্রিপ বলা হয়। সেই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রের ওপর আবশ্যক যে, তারা নিজের কৃষি ও শিল্প পণ্যকে রেজিস্টার্ড করিয়ে নেবে। অন্যথায় আন্তর্জাতিক বাজারে তারা তা বিক্রয় করতে পারবে না। অতঃপর যদি কোনো দেশ বা কোম্পানি কোনো পণ্যের রেজিস্টেশনের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হয়ে যায়, তাহলে বাকি অন্য কোনো দেশ এই পণ্য তৈরি করতে পারবে না। যার ফলে অন্যান্য সকল দেশ সেই বিশেষ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই দেশের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি বাংলাদেশ বাসমতি চাউলের কোনো একটি প্রকার রেজিস্টেশনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়ে যায়, তাহলে অন্য কোনো দেশ এই চাউল উৎপাদন করতে পারবে না এবং সবাই এই চাউলের জন্য বাংলাদেশের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য থাকবে। তেমনিভাবে বাংলাদেশের যদি বড় কোনো কাজের জন্য পণ্য দরকার হয়, যা তারা ব্যবসার মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারবে না, তখন তারা আবশ্যিকভাবে অপর দেশের ঋণের অপেক্ষা করবে। মোটকথা, যেহেতু স্বাভাবিকভাবে এই রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক ইজারাদারির ফলে বাণিজ্য থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না, তাই আবশ্যিকভাবে তাদেরকে অপর রাষ্ট্রের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। এটাই বর্তমান আন্তর্জাতিক গ্লোবালাইজেশন, যার দ্বারা ইহুদিদের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে।

এটি একদিকে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেয় এবং অপরদিকে প্রত্যেক দেশ ও জাতিকে জাতিসংঘের নীতির অনুগত হতে বাধ্য করে। যদি কোনো প্রশাসন তা মান্য করতে অস্বীকার করে, তখন তাকে জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত আন্তর্জাতিক আদালতে জবাবদিহি করতে হয়। এ ছাড়াও শান্তিবিষয়ক

কাউন্সিলের মাধ্যমে পশ্চিমারা যেকোনো দেশের ওপর হামলা করতে পারে, যারা তাদের দাজ্জালি হুকুমতের অনুগত হতে অস্বীকার করে।

গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কেমন যেন মনুষের রব!!!

সাধারণ ইচ্ছা(general will)' যখন 'সকলের ইচ্ছা'র(will of all) অনুগত হয়, তখনই মূলত সেই রাষ্ট্রের বিধান দেওয়ার অধিকার অর্জিত হয়, যা সমস্ত জনগণ 'নির্বাচন' এর মাধ্যমে গ্রহণ করে নিয়েছে। রাষ্ট্র সর্বময় বিধানদাতা হওয়ার পর জনগণকে তার আইন মেনে চলা আবশ্যক হয়ে যায়, কারণ তারা নিজেরাই এটাকে গ্রহণ করেছে। আর এভাবেই আইনের আনুগত্যের দ্বারা মানুষ মূলত নিজেই নিজের গোলামি করে এবং আইনের বিরোধিতা করা মূলত নিজেই নিজের বিরোধিতা করার সমতুল্য হয়ে যায়। এই ধরনের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে কেমন যেন মানুষ অন্য কোনো সত্তার বান্দা বা গোলাম না হয়ে তার নিজের গোলাম হয়ে যায়। কেননা, বাস্তবে সে নিজেই নিজের আদেশ মেনে চলছে এবং নিজেই নিজের চাহিদাগুলো পূর্ণ করছে। এই আইন তৈরির ক্ষমতাকে গ্রহণ করে নেওয়াই মানুষকে আলোকায়ন,উন্নতি, স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও সমতার নিশ্চয়তা দেবে।যেহেতু হুকুম দেওয়া জীবিত সত্তার গুণ, তাই রাষ্ট্রকে বিধানদাতা বানানোর দ্বারা মূলত তাকে 'বৈধ সত্তা' (Legal Personality) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পূর্বের সমস্ত মুশরিক তো জীবিত বা অস্তিত্বশীল মূর্তির পূজা করত; কিন্তু এই আধুনিক মুশরিকরা কাল্পনিক অস্তিত্বহীন রাষ্ট্রের মধ্যে বিধানদাতার রুহ ফুঁকে দিয়েছে, অতঃপর এটাকে পূজা করা শুরু করেছে। এই রাষ্ট্রকে রবের বন্ধু বা নিকটবর্তী নয়; বরং সরাসরি রব মনে করে পূজা করতে থাকে। এমনকি এই সমস্ত রাষ্ট্রকে এরিস্টটল, রুশো ও হিগেল-সহ অন্যান্যদার্শনিক প্রভুর মতোই সমস্ত ভুলের উর্ধ্বে দাবি করত। অর্থাৎ তাদের মতে রাষ্ট্র ভুল থেকে মুক্ত এবং এর ভুল হওয়াই অসম্ভব। কেমন যেন রাষ্ট্র মানুষের মতো এক সত্তা; কিন্তু কাল্পনিক ও সকলের উর্ধ্বে।

রাষ্ট্রের গঠন বোঝানোর জন্য দার্শনিকরা তাকে শরীরের সাথে তুলনা দিয়েছে। যার হাত, পা ও মাথা আছে। অতঃপর তারা এই সত্তাটির জন্য অধিকার ও করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। করণীয় দ্বারা উদ্দেশ্য রাষ্ট্রকে জনগণের সকল বিধান ও ফয়সালা দানের ক্ষমতা প্রদান করা, যা সংরক্ষণ ও প্রণয়নের দ্বায়িত্বশীল রাষ্ট্র নিজেই। অপরদিকে জনগণকে সেই রাষ্ট্রের হক বা অধিকার আদায় করতে হবে। যদি কেউ রাষ্ট্রের আদেশ পালন করে, তাহলে তাকে সেই রাষ্ট্রের সম্মানিত গোলাম বা নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু যদি সে অবাধ্যতা করে, তাহলে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে অপরাধী হয়ে যাবে, যার জন্য রাষ্ট্র কঠিন শান্তির ব্যবস্থা রেখেছে। যেমন এই ধরনের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ফরাসি বিপ্লবের পর পূর্বের বাদশাহি শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়া শুরু হয়ে যায় এবং পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সমস্ত পার্লামেন্ট এমন সংবিধান ও আইন প্রণয়ন করে, যা ছিল 'সকলের ইচ্ছা'র বাস্তবায়ন। মূলত বিধান প্রণয়নের এই ফর্মুলা থেকেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছিল, যার সামনে রাষ্ট্রের সব বাসিন্দা মাথা ঝুঁকিয়ে দেয় এবং এই সিজদাকেই তারা মানুষের আসল স্বাধীনতা মনে করে। বাস্তবতা হচ্ছে পশ্চিমা চিন্তাবিদরা 'রব' শব্দ ব্যবহার করা ব্যতীতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এমন সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করে যে, কেমন যেন এই রাষ্ট্রই মানুষের রব।

গনতন্ত্র কেন কুফরী

গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে শিরক এবং কুফরী হিসাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন :
(১) সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রের মূল কথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ সকল ক্ষমতার মালিক সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। একথা নিঃসন্দেহে শিরক। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ

‘রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই’ (বনী ইসরাঈল ১৭/১১১)।

তিনি আরো বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاء

‘তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন’ (আলে ইমরান ৩/২৬)।
অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
‘বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান’ (মূলক ৬৭/১)।
মহান আল্লাহ আরো বলেন,الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن
‘যার হাতে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই’ (ফুরক্বান ২৫/২)।

আল্লাহর বাণী থেকে বুঝা গেল আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক। মানুষকে ক্ষমতার মালিক বা উৎস বানানো তাঁর সাথে শরীক স্থাপনের শামিল, যা স্পষ্ট শিরক।
(২) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রে আইন-বিধান রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় পার্লামেন্ট সদস্যদের উপর। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যেটা বলবে, যে বিষয়ে সম্মত হবে সেটাই হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন, যার বিরোধিতা করা আইনত অপরাধ। গণতন্ত্রে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কুরআন-সুন্নাহর উপরে স্থান দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন তৈরী করতে পারে, এমনকি আল্লাহর আইনকে বাতিলও করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়া, মদের লাইসেন্স দেওয়া, সূদের বৈধতা দেওয়া, ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করা, ১৬ বছর বয়স পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা করলে তার বৈধতা দেওয়া, স্বামীর অনুমতিতে স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করলে তার বৈধতা দেওয়া, যাত্রা, সিনেমাহলে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার চর্চাকে অনুমোদন দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের নীতিমালা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের) ক্ষেত্রে শিরক এবং স্পষ্ট কুফরী। কেননা আল্লাহ বলেন,
اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ
‘শুনে রাখ! সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার’ (আ‘রাফ ৭/৫৪)।
তিনি আরো বলেন,إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ-
‘আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে

ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' (ইউসুফ ১২/৪০)।

তিনি আরো বলেন, وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 'আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পিছনে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' (রা'দ ১৩/৪১)।

৩) বিরোধ মিমাংসার ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রে যেকোন মতবিরোধ বা বিতর্কের চূড়ান্ত মিমাংসাকারী বানানো হয় সংবিধান ও এর ধারা সমূহ এবং পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে। এটা একটা স্পষ্ট কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন,فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতন্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' (নিসা ৪/৫৯)।

তিনি আরো বলেন,وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' (আহযাব ৩৩/৩৬)।

সুতারাং গনতন্ত্র একটি কুফরী , শিরকী ব্যবস্থ।

গনতন্ত্র কেন জাহিলিয়্যাত

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য ন্যায়-নিষ্ঠতা, জ্ঞান-গরীমা, সততা, আল্লাহভীরুতার কোনই শর্ত নেই। যেকোন নাস্তিক, কাফির, ফাসিক-ফাজির, নির্বোধ-জাহেল ব্যক্তি পার্লামেন্ট সদস্য হ'তে পারে টাকার জোরে বা দলীয় আনুগত্য বিবেচনায়। ফলে এসব সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জাহেলী আইন-কানূন প্রণয়ন করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার হওয়ার জন্যও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞানী-গুণী হওয়ার শর্তারোপ করা হয় না। ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহেল লোকদের ভোটে

শরী‘আত সম্পর্কে অজ্ঞরাই সাধারণত নেতা নির্বাচিত হয়। এজন্য গণতন্ত্রকে অনেক মনীষী মূর্খদের শাসন বলেছেন।

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, ‘বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের শাসন বলে এটা প্রকারান্তরে মূর্খের শাসন।

২. জন লেকি বলেন, ‘গণতন্ত্র দারিদ্র্য পীড়িত, অজ্ঞতম ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন ব্যবস্থা; কারণ তারাই রাষ্ট্রে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।[৪]

৩. মিশরীয় ইসলামিক স্কলার মুহাম্মাদ কুতুব বলেন, আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় বিধান হ’ল দু’টি। একটি হ’ল আল্লাহর বিধান অপরটি জাহেলিয়াতের বিধান (মায়েদাহ ৫০)। গণতন্ত্র আল্লাহর বিধান নয়। সুতরাং তা আল্লাহর মাপকাঠিতে জাহেলিয়াতের বিধান।

(১) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, ‘ইসলাম ও গণতন্ত্র দু’টি বিপরীতমূখী ব্যবস্থা। যা কখনো এক হবার নয়। একটি আল্লাহর উপর ঈমান ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি তাগূতের (আল্লাহ বিরোধী অনুশাসন) প্রতি ঈমান ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর নির্ভরশীল’।

(২) আবু কাতাদা ওমর বিন মাহমূদ বলেন, ‘যেসব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখতে চায়, তাদের প্রচেষ্টা যিন্দীকদের (যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরে কুফুরী গোপন করে) মত, যারা আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তন করে ফেলে। ... ইসলাম জনগণকে বিধানগত ক্ষেত্রে পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা দেয়নি; যেহেতু জনগণের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া আবশ্যকীয়। অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণকে তাদের উপর প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রণয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক তত্ব, যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিনষ্টকারী’।

(৩) ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল প্রচলিত এই নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের সর্বত্র এই নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সর্বত্র নেতৃত্বের লড়াই,

পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি এবং সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে’

(৪) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী **(রহঃ)** বলেন, ‘মোটকথা ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন নামে কোন কিছু নেই। এই নব আবিষ্কৃত তথাকথিত গণতন্ত্র শুধু একটি বানানো প্রতারণার বস্তু। বিশেষ করে এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা মুসলিম এবং কাফের শাসকদের সমন্বয়ে গঠিত, অনৈসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কী হবে?

গনতন্ত্র ওরফে ধোঁকাতন্ত্র

১)গনতন্ত্র মানে কি স্বাধীনতা?

অনেক মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মানে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও 'স্বাধীনতা' ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝাতে চাই: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চারিত্রিক স্খলনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেক। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রিসালাত, কুরআন, সাহাবায়ে কেরামের উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপর্দা, বেহায়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এ সবগুলো উম্মতের দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শিকলে এ স্বাধীনতা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনকে দোষারোপ করা অনুমোদন করে; কিন্তু 'নাৎসিদের ইহুদি নিধন' নিয়ে কথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিষেধ। বরং যে ব্যক্তি এ হত্যাযজ্ঞকে অস্বীকার করে তাকে শাস্তি দেয়া হয়, জেলে পুরা হয়। অথচ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; এটাকে যে কেউ অস্বীকার করতেই পারে।

যদি আসলেই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরকে নেয়ার সুযোগ দিল না কেন?! কেন তারা মুসলমানদের দেশগুলোকে উপনিবেশ বানাল, তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লিবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল অথবা ইতালিয়ানরা মিশরে গণহত্যা চালাচ্ছিল বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল?

এসব স্বাধীনতার দাবীদারদের নিকটেও স্বাধীনতা কতগুলো নিয়ম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত; যেমন-

১- আইন: কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, সে রাস্তাতে সাধারণ চলাচলের বিপরীত দিকে চলবে বা গাড়ী চালাবে। অথবা লাইসেন্স ছাড়া কোন দোকান-পাট খুলবে। যদি সে বলে আমি স্বাধীন; কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না।

২- সামাজিক প্রথা: উদাহরণতঃ কোন নারী সাগর যাপনের পোশাক পরে কোন মৃতব্যক্তির শোকাহত বাড়ীতে যেতে পারে না! যদি বলে আমি স্বাধীন, মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, তাড়িয়ে দিবে। কারণ এটি প্রথার বিপরীত।

৩- সাধারণ রুচিবোধ: উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মানুষের সামনে বায়ু ত্যাগ করতে পারে না! এমনকি ঢেকুর তুলতে পারে না। যদি সে বলে, আমি স্বাধীন, তাহলে মানুষ তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

এখন আমরা বলতে চাই,তাহলে আমাদের ধর্মের কেন এ অধিকার থাকবে না যে, আমাদের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করবে। যেমন- তাদের স্বাধীনতা বেশ কিছু বিষয় দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়েছে যে বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করতে পারে না?! কোন সন্দেহ নেই ইসলাম ধর্ম যা নিয়ে এসেছে এর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও মানুষের জন্য উপকার। নারীকে বেপর্দা হতে নিষেধ করা, মদপানে বারণ করা, শুকুর খেতে নিষেধ করা ইত্যাদি সব মানুষের শারীরিক, মানসিক ও জৈবনিক কল্যাণেই। কিন্তু ধর্ম যদি তাদের স্বাধীনতাকে বিধিবদ্ধ

করে তখনি তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদের মত অন্য কোন মানুষ বা অন্য কোন আইনের পক্ষ থেকে আসে তখন তারা বলে "শুনলাম ও মানলাম"।

প্রশ্ন হচ্ছে, সর্বোচ্চ বিধান প্রণয়নের এই ফর্মুলাকে গ্রহণ করে মানুষ রাষ্ট্রের কাল্পনিক সত্তার শিকল নিজের গলায় পরিধান করে সে মূলত কী থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে? এর শিকল বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবে যে, মানুষ এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা থেকে ,নবীদের আনুগত্য থেকে, দ্বীন থেকে, হালাল-হারামের মাপকাঠি থেকে, সাওয়াব ও গুনাহ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সুতরাং গনতন্ত্র স্বাধীনতার ফাঁকা বুলি উড়ায় কিন্তু বাস্তবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতা খোঁজা হয়, তা কেবল একটি প্রহসন মাত্র।

প্রতিনিধি কি সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচিত?

এই পদ্ধতিতে সাধারণত কম সংখ্যক লোকের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। যেমন:ধরা যাক একটি নির্বাচনী এলাকায় তিন থেকে চার পাঁচজন পর্যন্ত প্রার্থী থাকে। তার মধ্যে একজন প্রার্থী ভোট পেল ১০ হাজার, একজন পেল ১২ হাজার আর একজন পেল ১৪ হাজার, আর একজন পেল ১৫ হাজার। যে-ব্যক্তি পনের হাজার ভোট পেল সে-ই নির্বাচিত হলো। আর বাহিরে থাকল (১০+১২+১৪) মোট ৩৬ হাজার ভোট। তাহলে দেখা গেল এই ৩৬ হাজার ভোটারদের ভোট মাঠে মারা গেল, তাদের সমর্থন কোনো কাজে আসল না। এই অধিক সংখ্যক ভোটারের মত এবং তাদের ইচ্ছা রাষ্ট্রের কাজে কোনো প্রভাব ফেলতে পারল না। অথচ অল্প সংখ্যক ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে গেল প্রচলিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমে। এভাবে অল্প সংখ্যক ভোট পেয়েও সদস্যরা পার্লামেন্টে আসে। সুতরাং প্রমাণিত হলো মেজরিটি লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধি ক্ষমতায় যেতে পারে ,ক্ষমতায় যায় মাইনরিটি লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এটা আসলে ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়।

অধিকাংশ জনগণের মত অনুসারে কি শাসন চলে?

গনতন্ত্রে অধিকসংখ্যক জনগনের মনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় না কমসংখ্যক লোক শাসনক্ষমতায় আধিষ্ঠিত হয়।যেমন:
পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ৩০০ জন। এই ৩০০ জনের মধ্যে অন্তত ১৫১ জন যখন কাউকে সমর্থন করে তবে সে সরকার গঠন করে। এই ১৫১ জন লোকের প্রাপ্ত ভোট যদি গণনা করা হয় আর এর বাইরে যারা রয়ে গেল তাদের ভোট সংখ্যা গণনা করা হয় তাহলেও দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের বাইরে থাকা লোকদের পক্ষে বেশি সংখ্যক লোকদের সমর্থন (ভোট) রয়েছ। এখানেও দেখা যায় গণতান্ত্রিক সিস্টেমে মাইনরিটি বা কমসংখ্যক লোকেরাই শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে বসে।এরপর মনে করুন একটা পার্টির মধ্যে ১৬০ জন সদস্য পার্লামেন্ট মেম্বার। এখন সেই পার্টির মধ্যে আবার বিভিন্ন নেতার বিভিন্ন গ্রুপ আছে। সেই গ্রুপের মধ্যে যার লোক সংখ্যা বেশি তাদের সমর্থিত ব্যক্তি হয় প্রধানমন্ত্রী। অন্য গ্রুপের যে মত তা সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায়।আবার যখন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয় তখনো ঐ ১৬০ জন সদস্য আর মন্ত্রী-মিনিস্টার হতে পারে না। অল্প কয়েকজন সদস্যই কেবল সে সুযোগ পায়। তাদের হাতেই থাকে দেশের সর্বময় ক্ষমতা। ফলে সরকারের সমর্থনেও যে বাকি সদস্যরা রইলেন তাদের মতও অনেক সময় কার্যকর হয় না। তদের সপক্ষে যে জনগণ ভোট দিয়েছিল তাদের আশাও পূর্ণ হয় না। এভাবে যে কোনো দিক দিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, গণতান্ত্রিক সিষ্টেমে অল্প সংখ্যক লোকেরাই শাসনের আসল সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ মাইনরিটি বা কম সংখ্যক লোক দ্বারা দেশ শাসিত হয়। তদুপরি গণতন্ত্রটা একটা বিরাট ধোঁকা হয় তখন যখন একে মেজরটি লোকের শাসন বলে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়।

ইসলামী গনতন্ত্র কি কখনো হয়?

ইসলামী গনতন্ত্র নামে কোনো শব্দ নেই। ইসলাম এমন শব্দের সাথে যুক্ত হবে যেটাকে ইসলাম সমর্থন দেয়। গনতন্ত্রের মূল রুকনেই রয়েছে কুফর ও শিরক। সংসদে গিয়ে ইসলামের সকল বিধান বাস্তবায়ন করলেও এটাকে ইকামতে ইসলামী বলবে না, একে বলবে ইকামতে দেমোক্রেতি (ديمقراطية).সুতরাং ইসলামী গনতন্ত্র বলাটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। এটা একটা ধোঁকা।[2]

তাই বলতে হয়, গণতন্ত্র আসলে ধোঁকাতন্ত্র- একটা বাস্তব প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ এমন এক প্রতারণা যা দিনের উজ্জ্বল আলোতেই সবাইকে দেয়া হচ্ছে, অথচ কেউ বুঝতে পারছে না।

উপসংহার

খিলাফত ও গণতন্ত্র—এই দুটি শাসনব্যবস্থার তুলনা আমাদের সামনে একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। খিলাফত ও গণতন্ত্র দুটি ভিন্ন আদর্শিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো জনগণের ইচ্ছা এবং তাদের দ্বারা গঠিত আইন। এটি শিরক,কুফরী। গণতন্ত্র একটি আকর্ষণীয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে দেখা গেলেও এর বাস্তবিক দিকগুলোতে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, এবং নৈতিক সংকট গণতন্ত্রকে একটি ব্যর্থ মডেলে পরিণত করতে পারে। যদিও গণতন্ত্র ন্যায্যতা ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটি বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।
এজন্য ন্যায্য ও নৈতিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিকল্প চিন্তাধারা প্রয়োজন, যেখানে ইসলামি খিলাফত একটি কার্যকর উদাহরণ হতে পারে।
অপরদিকে খিলাফত এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা ইসলামের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এখানে মানুষের তৈরি আইন নয়, বরং আল্লাহর নির্ধারিত আইনই সর্বোচ্চ। এটি ইসলামের নির্দেশিত নীতি অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা। খিলাফত একমাত্র শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসকের কর্তৃত্ব আল্লাহর আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। এতে কোনো

[2] মুফতি তারেকুজ্জামান;সিয়ান সেমিনার ৪,২০২৪ইং

স্বেচ্ছাচারিতা বা মানুষের তৈরি আইন প্রণয়নের সুযোগ নেই। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে শাসক তথা খলিফা কেবল শাসক নন, বরং জনগণের সেবক এবং আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। খিলাফতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আল্লাহর নির্দেশিত শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। খিলাফতের মূল ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, যা একটি ঈমানি জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে। ইসলামি আইন অনুযায়ী শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবার জন্য সমান ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়। খিলাফতে শাসকের দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রশাসনিক নয়, বরং তিনি আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্ব পালন করেন। এতে শাসকের জবাবদিহি রয়েছে, জনগণের অধিকার নিশ্চিত হয়, এবং সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

খিলাফতে জনগণের সম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানার চেয়ে সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। শাসকের কোনো ভুল বা অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে জনগণ সরাসরি প্রশ্ন করতে পারে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

এ ব্যবস্থায় মানবসৃষ্ট আইনের মতো ত্রুটি ও দুর্বলতার স্থান নেই।

বর্তমান বিশ্বে যেসব সংকট দেখা যাচ্ছে—দারিদ্র্য, বৈষম্য, দুর্নীতি, এবং সামাজিক অস্থিরতা—এসব সমস্যার সমাধানে খিলাফত একটি যথাযথ বিকল্প হতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক সময় নেতারা নিজস্ব স্বার্থে কাজ করে, ফলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পদকে সীমিত কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে, যা গরিবদের আরও দরিদ্র করছে।

অন্যদিকে, খিলাফতের অর্থনৈতিক নীতিতে সুদ নিষিদ্ধ হওয়া, সম্পদের সুষম বন্টন এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে গরিব ও ধনী সবাই উপকৃত হয়। আজকের সমাজে নৈতিক অবক্ষয় এবং পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা খিলাফতের মতো শাসনব্যবস্থা দিয়ে দূর করা সম্ভব, যেখানে সমাজের প্রতিটি স্তরে নৈতিকতার চর্চা বাধ্যতামূলক। খিলাফতের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক সংকটের সমাধানও সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের অভাব এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলো খিলাফতের আওতায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এটি কেবল মুসলিম বিশ্বের জন্য নয়, বরং গোটা

মানবজাতির জন্য শান্তি এবং স্থিতিশীলতার বার্তা বয়ে আনতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্র মানব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলেও এটি মানবজীবনের সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম নয়। এর সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাগুলো প্রমাণ করে যে, এটি কোনো চূড়ান্ত সমাধান নয়। খিলাফত, অন্যদিকে, এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা শুধুমাত্র তত্ত্বগত নয়, বরং বাস্তব প্রয়োগেও একাধিকবার সফলতার প্রমাণ দিয়েছে। এটি মানবজাতির জন্য শান্তি, ন্যায়বিচার এবং স্থিতিশীলতার গ্যারান্টি প্রদান করে।

অতএব,, খিলাফতই মানবজাতির প্রকৃত মুক্তির পথ। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা ধর্ম, নৈতিকতা এবং মানবকল্যাণকে একীভূত করে। গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং খিলাফতের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে বলা যায়, ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের জন্য একটি উত্তম ও টেকসই। এটি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়, বরং গোটা মানবজাতির জন্য শান্তি ও ন্যায়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে ইনশা আল্লাহ।

"খিলাফতই উত্তম"

"খিলাফত ছাড়া কোনো বিকল্প নেই"

রেফারেন্স:

১)ইসলামে রাষ্ট্রব্যবস্থা;ড.মো:ইব্রাহীম খলিল

২)ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা;হেদায়াতুল্লাহ মেহমান্দ

৩)গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরায়ী নিজাম;মাওলানা মো:আবদুর রহীম

৪)https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/Muktomonabloger/30136377

৫)https://at-tahreek.com/article_details/2068

৬)https://islamqa.info/bn/answers/98134/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B7%E0%A6%9F%E0%A6%A4-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%B0

৭)https://maroonpaper.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A6%A3/

৮)https://prosnouttor.com/democracy-in-bengali/?amp=1